অভিমন্যু

রমাপদ চৌধুরী

banglaboipdf.com

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

www.banglabooks.in

Click here

অভিমন্যু

একটা ক্লান্ত অন্যমনস্কতা এসময় অরিজিৎকে আচ্ছন্ন করে থাকে। হাঁটে, বসে, পোশাক বদলায়, কথা বলে, তেমন কৌতুককর কথা শুনে হাসেও, কিন্তু কিছুই মনে থাকে না। পরের দিন স্ত্রী বা মেয়ে প্রসঙ্গ টেনে মনে পড়াতে চাইলে অবাক হয়ে বলে, সে কি, কখন বললে ? শুনিনি তো ! ওরা সকলেই হেসে ওঠে। এতদিনে ওরা সকলেই জেনে গেছে অরিজিৎ মানুষটা কেমন আপনভোলা, রীতিমত অন্যমনস্ক। তাব জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা গর্বও ওদের না থাকার নয়। কিন্তু এই অন্যমনস্কতা শুধু এই সময়টাতেই।

মাথার ভিতরে সমস্ত কোষগুলো এ-সময় কেমন ভোঁতা ভোঁতা হয়ে যায়। হয়তো অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে। হয়তো এতক্ষণ ধরে একটা বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসে থাকতে হয় বলে।

অরিজিৎ ব্যানার্জিকে এখন অনেকেই এক ডাকে চেনে। এই পঞ্চাশ বছর বয়েসেই। চল্লিশ পার করেও যে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিল।

মেয়ে অঞ্জনার কথাগুলো প্রথমে অরিজিতের কানে যায়নি, কিংবা বলা যায় কানে গিয়েছিল দুর্বোধ্য শিলালিপির ওপর চোখ পড়ার মত। পাঠোদ্ধার করতে পারেনি। কয়েকটা পরিচিত শব্দ শুধু, যার নিহিত অর্থ পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আসলে ঐ ক্লান্তি আর আচ্ছন্নভাবের বেশটা এ-সময়ে থেকেই যায়, মানুষটাই তখন যন্ত্রের মত কৃত্রিম।

অঞ্জনা দ্বিতীয়বার খুব উল্লাসের সঙ্গেই বললে, বাপি সত্যি বলছি, এইমাত্র টি ভি-তে শুনলুম। কি গ্র্যান্ড খবর, বলো বাপি ?

স্ত্রী পারমিতার মুখেব দিকে তাকিয়ে অবিজিৎ দেখল, তার মুখ আনন্দে হাসি হাসি।

পারমিতা অরিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি ওকে কংগ্র্যাচুলেট করবে না ? অঞ্জু ডায়াল করে দেবে ?

টেলিফোন এতক্ষণ নীচে চেম্বারে ছিল। গোপাল রিসিভার তুলে এনে প্লাগপয়েন্টে লাগিয়ে সেটা ঝাড়ন বুলিয়ে মুছে দিয়ে চলে গেল। ওটা দেখেই পারমিতা বললে। অরিজিৎ ওপরে থাকলে এতক্ষণে নিজেও কংগ্র্যাচুলেশনস জানাত, হয়ত কাল সন্ধেবেলা খাবার নেমন্তন্নও জানিয়ে রাখত।

এ তো একটা অভাবনীয় সাকশেস। দীপঙ্কবের।

অরিজিৎ টি ভি দেখে না, দেখার সময় পায় না। সেজন্যেই খবরটা জানতে পারেনি।

অবাক হয়ে বললে, দীপঙ্কর ? দীপঙ্কর রায় ?

পারমিতা হেসে উঠে বললে, শুনছ কি তাহলে ? আমাদের দীপঙ্কর !

'আমাদের' কথাটায় পারমিতা হয়তো একটু বেশি জোর দিয়ে ফেলল, আর সেজন্যেই অরিজিতের কানে খট্ করে লাগল। চেনাজানার মধ্যে একজন নিশ্চয়ই, কিন্তু অরিজিৎ জানে মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব আছে। সেই দূরত্ব কেন তা নিজেই জানে না।

অরিজিতের দিনগুলো ব্যস্ততার মধ্যে কাটে, জীবনটাও। জীবনকে ও অনেক পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছে। ওর মধ্যে যতটুকু যোগ্যতার সম্ভাবনা ছিল সব উজাড় করে দিয়ে।

এখন নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগে। বিলেত থেকে ফিরে এসে চাকরি নিয়ে কলকাতায় এক বছরও কাটেনি, মফস্বলে মফস্বলে ঘুরতে হয়েছে। শেষে অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে কলকাতা। তখন ভাড়ার ফ্ল্যাট, ছোট্ট চেম্বার। দু-চারটে হঠাৎ রুগী,

বেশির ভাগ সময় কাটাতে হত বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, কিংবা উপন্যাস পড়ে।

তারপর কোত্থেকে কিভাবে যেন দিনগুলো বদলে যেতে শুরু করল। তখন রাতারাতি খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে। চেম্বারে ভিড়। এখন আরও।

দক্ষিণে খুব সুন্দর একখানা বাড়ি বানিয়েছে, আধুনিক ডিজাইনের গ্রিল আর কাচ আর বে-উইন্ডো নিয়ে, বাইরে থেকে দেখলে, স্বপ্নপুরীর মত। ভিতরটাও। দামী মোজেক, প্রথম প্রথম তার মসৃণতায় পা হড়কে যেত। গোপাল একবার অনভ্যস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে আছাড় খেয়েছিল। এখন ঘরে ঘরে কার্পেট, কাযদার সিঁড়িতে দামী ডোরি। সবচেয়ে সুন্দর হল রাস্তার দিকের ব্যালকনি। রঙিন টবে ঝোলানো গাছ, কোনায় মানিপ্ল্যান্ট লতিয়ে উঠে সবুজের নকশা।

গৃহপ্রবেশে দীপঙ্করও এসেছিল। ফুর্তিবাজ ছেলে, হৈহল্লা কবে জমিয়ে রেখেছিল। অরিজিৎ ব্যানার্জির জীবনে সেও আরেক সাফল্যের দিন। সকলেই এই তিনতলা বাড়িটার এক একটা দিক নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল। অরিজিৎ নিজেও তখন প্রচণ্ড খুশি। এ রকম পশ্ এরিয়ায় এত ভাল জমি পাওয়া যাবে তা যেমন ভাবেনি, তেমনই আর্কিটেক্টেব আঁকা নীল-সাদার জ্যামিতিক বেখাগুলো যে শেষ অবধি এত সুন্দব হয়ে উঠবে তা কল্পনাব বাইরে ছিল। সেই মুহূর্তে অরিজিতের মনে হচ্ছিল বাড়িটা তাব সাফল্যেব সার্টিফিকেট। বিলেতে যেদিন দুষ্প্রাপ্য ডিগ্রিটা হাতেব মুঠোয পেয়েছিল সেদিনও এত আনন্দ হয়নি, কাবণ ভবিষ্যৎ তখন অনিশ্চিত।

এখন তো পঞ্চাশ পাব হতে না হতে ভবিষ্যতের স্টেশনে পৌঁছে গেছে। এখন আবাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে দিব্যি উপদেশ দেওয়া যায়, কোন্ ট্রেন ভালো, কিভাবে টিকিট আব রিজার্ভেশন পাওযা যায, কোথায লাঞ্চ, কোথায় ডিনাব, ডাইনিং কাবেব খাবাব ভাল কি মন্দ, সার্ভিস কেমন।

অতিবৃদ্ধ সেই সার্জেন চ্যাটার্জি এখন মারা গেছেন, বয়সেব দরুন সব চুল পাকা, পবিমিত মদ্যপানে রুপোর বেশমের মত ঝকঝকে, বার্ধক্যেব বসিকতায পারমিতাকে বলেছিলেন, নাও ইউ শুড বি দি হ্যাপিযেস্ট ওম্যান। টাকা থাকলেও এই পজিশনে বাড়ি! তা হলে মিসেস ব্যানার্জি, জীবনে যা-কিছু পাওযার সবই তো পেযে গেলে। এর ওপব অরিজিতেব যা প্র্যাকটিস....রসিকতা কবে বলেছিলেন, হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, আব একটাই শুধু অভাব এখন, ইউ নীড এ বোম্যান্টিক রোমিও। তাহলেই ষোলকলা পূর্ণ।

সকলেই সশব্দে হেসে উঠেছিল।

পারমিতাকে দেখে বয়েস অনেক কম মনে হয়, শরীরের একটা বাঁধন আছে, পোশাকে আরও। সে হেসে ভুরু তুলে স্মার্ট ভঙ্গিতে বলেছিল, কেন, আপনি?

—গুড লর্ড। ছ ফুট লম্বা কৃষ্ণবর্ণ চ্যাটার্জি শ্রাগ কবে হতাশায় দু হাত ছড়িযে বলে উঠেছিলেন, ইট্স্ নট এ কমপ্লিমেন্ট। তুমি কি ভেবেছ বুড়ো হয়েছি বলে আমাব প্র্যাকটিস পড়ে গেছে? ও নো। তোমার স্বামীব মতই আমারও সময় নেই।

ওঁর ভাবভঙ্গি দেখে পারমিতাও হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

সময় সত্যিই নেই অরিজিতেবও। সকালে ভাল করে খববের কাগজেও চোখ বোলানো হযে ওঠে না।

হঠাৎ এক একদিন, নিজের ওপরই রেগে গিযে বলে ওঠে, আমি তো এখন শুধু টাকা রোজগারের মেশিন হয়ে গিয়েছি!

অবশ্য জানেন ওটাই আজকের দিনে সাকশেসের জয়তিলক। লোকে টাকা অকারণে দেয় না, অকারণে এসে তারা চেম্বারে ভিড় করে বসে থাকে না। রোগ সেরে যাওযার পর কাবও কারও চোখে কৃতজ্ঞতার যে আপ্লুত দৃষ্টি ও দেখতে পায়, তা সাময়িকভাবে হলেও

ওর বুকের ভিতরটা ভরাট করে দেয়। আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

কে যেন একবার বলেছিল, সবই লাক্ ব্যানার্জি, সবই কোষ্ঠীব ফলাফল।

শুনে অরিজিতেব মনে হয়েছিল যেন ওকেই অপমান কবা হচ্ছে। উপহাস করে জবাব দিয়েছিল, তাহলে অসুখে ট্রিটমেন্ট করাব কি দবকাব, ও তো আপনিই সেরে যাবে। স্টার ভাল থাকলে।

মুখে যাই বলুক, অরিজিতের একটা ভয-ভয় ভাবও আছে। ছিল না, আজকাল মাঝে মাঝে হয। নার্ভ ? কি জানি।

লাক্ জিনিসটা সেই প্রথম জীবনে বিশ্বাস করত। প্র্যাকটিস শুরু কবার প্রথম দিকে। তারপর সাফল্যের দিকে ছুটে যেতে যেতে ভুলে গিয়েছিল। ওসব নিয়ে ভাবনাচিন্তার সময়ও ছিল না। ইদানীং মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়। কোন কোনদিন ভিজিটর্স শ্লিপের শেষ নম্বরটা দেখে নেয। কমল, না, বাডল। কদাচিৎ যদি পাঁচ-দশটি কমও হয, মনে মনে তার কারণ খুঁজে বেব কবে। মাসের শেষ, অথবা এই বর্ষায় কি কবেই বা আসবে।

আসলে সব সাফল্যেব মধ্যেই বোধহয এক ধবনেব আশঙ্কা লুকিযে থাকে। তখন অ্যাম্বিশন হিসেবনিকেশেব মধ্যে ধবা পডে গেছে। আরও দৌডতে পাবব কিনা, পৌঁছনোর মত কোন জায়গা আছে কিনা, সে-সব তখন জানা হয়ে যায়। একটাই তখন প্রশ্ন, যেখানে আছি সেখানেই থাকব তো ! সেটা শুধুই টাকা-আনাব প্রশ্ন নয। সম্মানেব প্রশ্ন। মর্যাদার প্রশ্ন।

সেই ভযেই বেসবকাবী একটা নামী হাসপাতাল আর একটা-দুটো নার্সিং হোমেব সঙ্গে নিজেকে যুক্ত বেখেছে।

ডাক্তাব সরকার পি জি থেকে বিটাযাব কবাব বছব দুই বাদে হঠাৎ একদিন তাব সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল অবিজিৎ। চমকে উঠেছিল ধুলো-পডা চেম্বাবেব চেহাবা দেখে। ভৌতিক নির্জনতায দুটি মাত্র রুগী। অথচ একসময দেখে গেছে তাঁব সেই চেম্বাব ভিডে ঠাসা।

যতই বযেস হচ্ছে অবিজিতেব মনেও দ্বিধা দেখা দিচ্ছে। আমাব খ্যাতি, আমার যোগ্যতাই এই সাকশেসেব মূলে, নাকি ঐ হাসপাতাল, নার্সিং হোম, বন্ধুচক্র ?

নাঃ, আমিই। আমাব ভবিষ্যৎ আমি নিজেই গড়ে তুলেছি। আমাব উপার্জনেব প্রতিটি কর্পদক আমাব পবিশ্রমের মূল্য। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার।

এ-সব ক্ষণিকেব ব্যাপাব, এত ধীবে-সুস্থে চিন্তা কবাব সময নেই অবিজিতের। সকালে উঠেই টেলিফোন টেলিফোন, প্রাত্যহিকতা, স্নান সেবে হেভি ব্রেকফাস্ট, নটাব মধ্যে হাসপাতাল। তারই ফাঁকে, পথে পডলে দু পাঁচটা কল্ সেবে নেয়। কখনো দুপুবেও।

বাডি ফিবে সামান্য বিশ্রাম। তাবপব চাবটে বাজলেই নীচেতলাব চেম্বাবে নেমে আসে। গোপাল বিসিভাব খুলে নিযে নীচেব প্লাগপয়েন্টে লাগিযে দিযে যায। একসময বলে যায, বাবোটা শ্লিপ জমা পডেছে। কোনও দিন, পনেরোটা।

কিন্তু চেম্বাবে গিযে বসতে না বসতে ভিড বাডতে থাকে। বেশিব ভাগই আসে অফিস ছুটিব পব। নটা সাডে নটার আগে ওর কিন্তু ছুটি হয় না। কোনও কোনও দিন বাত দশটা সাডে দশটা।

আজকাল প্রফেশনের বাইবে যোগাযোগও কমে গেছে। কোথায কি চলছে খববও পায় না, খবব জানার আগ্রহও কম। এর নাম সাকশেস।

যথাবীতি বিকেল চারটেব সময চেম্বাবে নেমেছিল। একটানা রুগীর পর রুগী দেখে গেছে, প্রথম দিকে ধীরে-সুস্থে, তাবপব শ্লিপ বাখাব ট্রে যত জমে উঠেছে, ততই দ্রুত। অবশ্য বোগবিশেষে। যেখানে প্রযোজন, সময দিতে কার্পণ্য করে না অবিজিৎ। জীবনে

টাকাই সব নয়। একটা দুরূহ রোগ সারিয়ে তোলার মধ্যে যে আনন্দ, হ্যাঁ এখনও পায়, তা প্রচুর টাকা অথবা এই সুদৃশ্য বাড়িটাও দিতে পারেনি।

এরই ফাঁকে দু একজন বন্ধু ডাক্তার কখনো এসে পৌঁছয়, কিংবা পরিচিত অথবা প্রভাবশালী কেউ। তাদের জন্যে একটু বেশি সময়ই দিতে হয়, বুঝতেও পারে, বাইরে অপেক্ষমাণ রুগী অথবা রুগীর আত্মীয়রা অধৈর্য হয়ে উঠছে, চটে গিয়ে দু একটা কটুকাটব্য করছে। কিন্তু অরিজিৎ নিরুপায়। সব দিক সামলেই তো চলতে হবে। এরই ফাঁকে কোনও দিন কোনও মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এসে হাজির হয়। নিজের স্বার্থেই তাকেও সময় দেয়। রুগী ঘরে থাকতে থাকতেই বেল বাজায়। অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেই থাকে রুগীরা। মুখে বলতেও পারে না, এবার আসুন। নিজেরা এতক্ষণ অপেক্ষা করে থেকেও খেয়াল রাখে না বাইরে আরও অনেকে অপেক্ষা করছে। অতএব ঐ বেল বাজানো। গোপাল বেল শুনে ভিতরে এলেই তার হাতে একটা শ্লিপ তুলে দিয়ে দেয়। শ্লিপের রুগী নাম ডাকার আগেই চলে এসেছে। এসব ব্যাপারে ওরা নিজেরাই ঠিক হিসেব রাখে কে কার পরে।

সমস্ত রুগী বিদেয় হওয়ার পরই একটা ক্লান্তি নেমে আসে। বেশ বুঝতে পারে, এতক্ষণ নিতান্তই নেশার ঘোরে কাজ করে গেছে। মানসিক এবং শারীরিক দুটো পরিশ্রমই ওকে ক্লান্ত করে দেয়। এই ক্লান্তির মধ্যেই শ্লিপগুলো গুছিয়ে তুলে রাখে অরিজিৎ, কাঠের ক্যাশবাক্সের ডালা খুলে একবার দেখে। নোটের তাড়া উপচে পড়ছে। এবার সেটা বন্ধ করে চাবি লাগিয়ে গোপালকে ডাকে।

দু হাতে ক্যাশবাক্সোটা গোপাল দোতলায় নিয়ে যায়। অরিজিৎ ক্লান্ত পা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে, তার পিছনে পিছনে।

টাকা মাটি, মাটি টাকা ওসবের আর কোন খোঁজই রাখে না অরিজিৎ। গোপাল বাক্সোটা নিয়ে গিয়ে পারমিতার সামনে টেবিলে রেখে দেয়। তারপর রিসিভারটা প্লাগপয়েন্ট থেকে খুলে ওপরে নিয়ে আসে। অবশ্য আরেকটা টেলিফোন আছে, সেটা দোতলাতেই থাকে। শোবার ঘরে। কিন্তু তার নম্বরটা ডাইরেকটরিতে ছাপা নিষেধ। ওটা ব্যক্তিগত।

স্নান সেরে এসে খাবার টেবিলে বসল অরিজিৎ। কোন গুরুতর কেস থাকলে, এ-সময় আবার হসপিটালে একটা চক্কর দিয়ে আসতে হয়। বড় গাড়িটা বের করে ড্রাইভার শিউলাল বসে আছে ফটকের সামনে। ওটা ইম্পোর্টেড। বড় গাড়ি মানেই বড় ডাক্তার। অন্তত রুগীদের তাই ধারণা। ছোট গাড়িটা দিশি, ওটা দু তিন বছর অন্তর বদলায়। ইনকাম ট্যাক্সে ডিপ্রিসিয়েশনের রেহাই মেলে। গায়ে আঁচ লাগে না।

খাবার টেবিলে বসে দু হাতে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মেয়ে অঞ্জনাকে বললে, শিউলালকে বলে দে, গাড়ি তুলে দিতে। আজ আর হসপিটালে যাব না।

অঞ্জনা উঠে গেল, ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ওখান থেকেই বলে দেবে।

অরিজিৎ এবার পারমিতার দিকে না তাকিয়েই জিগ্যেস করল, হ্যাঁ, দীপঙ্করের ব্যাপারটা কি ভাল করে শুনলামই না।

পারমিতা চোখ তুলে তাকাল, অরিজিৎকে একটুক্ষণ দেখল। আশ্চর্য মানুষ। সবই তো বলা হয়েছে, অথচ কিছুই শোনেনি। এদিকে পারমিতার খুব খারাপ লাগছিল, দীপঙ্করকে ফোন করে অরিজিৎ কংগ্র্যাচুলেশনস জানাল না বলে। ওর নিজেরই ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সে তো আরও খারাপ দেখাবে। অরিজিতের মুখ থেকে শুনতেই তো তার ভাল লাগার কথা। বিশেষ করে অরিজিতের মত একজন টপ প্র্যাকটিশনারের মুখ থেকে।

অঞ্জুকে বেশ মিহি মোলায়েম সুরে কথা বলতে শিখিয়েছে পারমিতা, যদিও নিজে সেভাবে বলতে পারে না। অরিজিৎ ঠিক জানে না, হয়তো অঞ্জু নিজেই শিখেছে কলেজের

কোন বন্ধুকে দেখে। এসব দেখার চোখ নেই ওর, সময়ও নেই। কিন্তু অঞ্জু যখন ফোন ধরে, অথবা কারও সঙ্গে কথা বলে, বেশ লাগে অরিজিতের। 'কে বলছেন ?' 'কি বলতে হবে বলুন।' কিংবা 'ডক্টর ব্যানার্জি এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন' জাতীয় শেখানো কথাগুলো ও সেই ইস্কুলের বয়েস থেকেই কেমন গলে পডা আইসক্রিমেব মত মোলায়েম গলায় বলে, বড়ো ভাল লাগে।

শিউলালকে গাড়ি তুলে দিতে বলে অঞ্জু ততক্ষণে খাবার টেবিলে ফিরে এসেছে। এসেই বললে, তোমার কিন্তু খুবই অন্যায় হয়ে গেছে বাপি।

অরিজিৎ ভুরু তুলে মেযের মুখের দিকে তাকাল, বেশ একটা আদরের ভঙ্গিতে। মেয়ের কোন আব্দার রাখতে পারেনি, কিংবা ফেরার পথে গাড়ি দাঁড কবিয়ে শিউলালকে দিয়ে ফ্লুরির কেক কিনে আনতে।

—দীপঙ্করকাকুকে তোমার একটা ফোন কবা উচিত ছিল না ? বলো ? এতক্ষণে কত লোক ওকে অভিনন্দন জানিয়ে দিয়েছে।

পাবমিতা গম্ভীব গলায বললে, ও তো সবাই জানে একেবারে আনসোশ্যাল।

অরিজিতের এই সব অনুযোগ শোনা অভ্যাস হয়ে গেছে, শুনে হাসে। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে হাসতে পাবল না। কোথায বুকে গিযে লাগছে।

সবই শুনেছে, সবই কানে গেছে। তারপব অনুযোগেব উত্তব হিসেবেই যেন প্রশ্ন করল, ব্যাপারটা তো ভাল করে শুনলামই না। হ্যাঁ, কি যেন কবেছে ?

পারমিতা হঠাৎ কি মনে পডতে উঠে দাঁডাল, চেযার ঠেলে দিয়ে চাবিব গোছা নিয়ে গিযে গডবেজের আলমাবিটা খুললে। অবিজিৎ চোখ তুলে তাকাতেই লকারের ফাঁকে থবে থবে সাজানো নোটের বান্ডিল দেখতে পেল। ওগুলো অনেক হিসেব কবে ভেবেচিন্তে ব্যাঙ্কে জমা দিতে হয়।

পারমিতা হাসতে হাসতে ফিরে এল, লকার এবং আলমাবি বন্ধ করে। —ভাবলাম টাকাগুলো তুলে বাখতে ভুলে গেছি।

ক্যাশবাক্সোটা ওপবে তুলে আনার পর পাবমিতাব এই একটাই কাজ।

অরিজিৎ বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণার ক্ষোভ লুকিয়ে বিষণ্ণতার হাসি হাসল। মনে মনে বললে, ঐ টাকাগুলোই আমাব ডিফিট। পরাজয়।

পারমিতার দিকে, অঞ্জুর মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না অবিজিৎ। কেমন একটা দুর্বোধ্য লজ্জায সঙ্কোচে। যেন হঠাৎ সেই ঋজু দীর্ঘ দেহের মানুষটা ছোট হযে গেছে।

ওদেব জন্যেই। হ্যাঁ, ওদেরই জন্যে। স্ত্রী এবং মেযে যেন এই মুহূর্তে ওব পরম শত্রু হযে দাঁডিয়েছে।

কিন্তু ঠিক বিশ্বাস কবতেও ইচ্ছে হয না। ওবা হযতো ভুল শুনেছে। তাছাডা, তাছাডা দীপঙ্করকেও বিশ্বাস করা যায না।

সবাই নিঃশব্দে চুপচাপ খাচ্ছিল। অবিজিৎ হঠাৎ বলে উঠল, কাল খবরেব কাগজটা আগে দেখি ; কি শুনতে কি শুনেছো !

পারমিতা কোন জবাব দিল না। শুধু অঞ্জু বলে উঠল, বাঃ রে, আমরা দুজনই ভুল শুনলাম ?

অরিজিৎ হাসবার চেষ্টা করে বললে, কোন দীপঙ্কর কে জানে।

আসলে ও হযতো মনে মনে চাইছিল, যেন অন্য দীপঙ্কব হয। দীপঙ্কর রায় তো আবও কতই থাকতে পারে।

না, ঐ দীপঙ্করই !

রাতে ভাল ঘুম হয়নি, পরের দিন সকালে খববের কাগজটার জন্যে অধীব আগ্রহে

অপেক্ষা করেছে। তারপর কাগজ আসতেই খবরটা খুঁজেছে। বেশি খুঁজতেও হয়নি, কারণ দীপঙ্করের একটা ছোট ছবিও ছেপে দিয়েছে।

কাল রাত্রেই পারমিতার কাছ থেকে খবরটা শুনে বুকের মধ্যে একটা দারুণ ধাক্কা খেয়েছে অরিজিৎ।

মনে হয়েছে সমস্ত জীবন যেন এক লহমায় ব্যর্থ হয়ে গেল। এটা কি সত্যি ঈর্ষা? অরিজিৎ বুঝতে পারে না। নাকি হঠাৎ ধরতে পেরেছে সমস্ত জীবনটাই অর্থহীন। এই প্রফেশনাল খ্যাতি, টাকা, সুখী ব্যস্ততার জীবন, এই বাড়ি, প্রাক্তন ছাত্রদের সমীহ, বহুলোকের কৃতজ্ঞতা।

আজ সকলের চোখ দীপঙ্করের দিকে। এমন কি পারমিতা আর অঞ্জুর কাছেও সে একজন হিরো হয়ে গেছে। অথচ এই দীপঙ্করকে ভেবেছিল একজন ফেলিওর। কত উপদেশ দিয়েছে। পাগলামি করে ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে নিষেধ করেছিল। সকলেই করেছিল। ওকে নিয়ে কত হাসাহাসি।

অরিজিৎ কিন্তু দীপঙ্করের সাকশেস চেয়েছিল। মোটামুটি একটা প্র্যাকটিস গড়ে উঠুক। অরিজিৎ তাহলে সাহায্যও করত। ওর চেষ্টাতেই তো কতজন দাঁড়িয়েও গেছে। দীপঙ্কর ওর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, যদি ওর থেকেও তার নাম এবং প্র্যাকটিস বেড়ে যেত, তাহলেও এমন কষ্ট পেত না।

অরিজিৎ ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠল, নিজেই ডায়াল করল। আজকাল কানেকশন পাওয়া যায় না বড়ো একটা। দু তিনবার ডায়াল করেও না পেয়ে ভাবল, না পেলেই যেন ভাল হয়। কিন্তু না, পাওয়া গেল।

—আই হ্যাভ ডান ইট, আই হ্যাভ ডান ইট।

পরিচয় দিয়েই খুব একটা যেন আনন্দ পেয়েছে এমন ভাব দেখাল অরিজিৎ, কথায় হাসিতে।—কি কাণ্ড করে বসেছো দীপঙ্কর! আমি তো ভাবতেই পারিনি। কংগ্র্যাচুলেশনস।

আঃ, এই সব অভিনয় করা আরও কষ্টকর।

কিন্তু দীপঙ্কর একটুও সন্দেহ করল না। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠল, আই হ্যাভ ডান ইট, আই হ্যাভ ডান ইট।

অরিজিৎ হাসতে হাসতে বলল, যাচ্ছি একদিন, গিয়ে কথা হবে। নাঃ, একটা কাজের মত কাজ করলে তুমি!

রিসিভার নামিয়ে রাখল। তারপর নিজের কথাটাই নিজেকে ভাবিয়ে তুলল। ওদিকে কোনও কল্ থাকলে ফেরার পথে কখনো হয়তো হর্ন বাজিয়ে অথবা শিউলালকে পাঠিয়ে দীপঙ্করকে নামিয়ে এনেছে, আবার তার পীড়াপীড়িতে নিজেই নেমে গিয়ে চা খেয়েছে। সে কদাচিৎ। আসলে দীপঙ্করকেই আসতে বলত। চলে এসো একদিন। অথবা, আজ আমাদের সঙ্গে খাবে। অরিজিতের মনে পড়ল না এর আগে কখনো এ-রকম কথা বলেছে কিনা। যাচ্ছি একদিন। গিয়ে কথা হবে। 'চলে এসো' না বলে 'যাচ্ছি একদিন'। এই ঘটনাটা কি সব কিছু উলটেপালটে দিয়ে গেল নাকি।

অসহ্য, অসহ্য।

একটা মানুষ যে-কিনা সব দিক থেকে অপদার্থ প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, যার প্রায় কোনও পরিচয়ই ছিল না, কথায় কথায় যাকে অরিজিৎ উপদেশ দিত, তার বন্ধুরাও, সেই মানুষটা হঠাৎ যেন সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকিয়ে হাসছে।—আই হ্যাভ ডান ইট, আই হ্যাভ ডান ইট।

যত ওপরেই উঠুক, দীপঙ্কর তো অরিজিতের কোন ক্ষতি করেনি। তবে এত কষ্ট কেন!

অরিজিৎ আবার ডায়াল করল। এবার ডাক্তার সান্যালকে। রামানন্দ সান্যাল। ল্যান্সডাউনে বিরাট একটা নার্সিং হোম করেছে। গাইনি হিসেবে যথেষ্ট নাম করেছিল, এখন নার্সিং হোমের ব্যবসায় আরো ফেঁপে উঠছে। অরিজিতের সঙ্গে সেই কলেজ-জীবন থেকে বন্ধুত্ব।

—রামানন্দ, কাগজ দেখেছো ? দীপঙ্করের ব্যাপারটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ।

অরিজিৎ একটা অট্টহাস শুনতে পেল। ওর নিজের মুখেও হাসি ফুটল।

রামানন্দ বলছে, বিশ্বাস করেছো নাকি ? শিয়ার ব্লাফ। দীপঙ্করকে তুমি কি আজ চিনলে ? রামানন্দ হাসছে।—কোনও দিকে কিছুই তো হল না, ও একটা সেনসেশন কবতে চাইছে। আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি না।

অরিজিৎ যেন বেশ নিশ্চিন্ত বোধ কবল। নাঃ ; সব বাজে খবর।

—ইভন থিওরেটিক্যালি ইটস ইমপসিবল। অরিজিৎ যেন তখনও বামানন্দব কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে ! রামানন্দ হাসতে হাসতে যেন বলছে, ওসব যদি সম্ভব হত, সাহেবরা অনেক আগেই তা আবিষ্কার কবে বসত। টু স্পিক দি ট্রুথ, আমাদেব দৌড ঐ কালাজ্বর অবধি। কি বলো ?

রিসিভারটা নামিয়ে বেখে অরিজিৎ দেখল, পারমিতা এসে দাঁডিযেছে।

—কাকে ফোন করলে, দীপঙ্কবকে ? বললে না, আমিও দুটো কথা বলতাম। পারমিতা হাসি হাসি মুখে বললে, এত ভাল লাগছে।

অরিজিৎ হেসে উঠে বললে, দাঁড়াও, রামানন্দ তো বলছে সব বাজে খবব। ও বিশ্বাসই করছে না।

একটু থেমে বললে, দীপঙ্কর কিন্তু চিবকালই একটু হামবাগ।

পারমিতা অখুশি ভুরু তুলে বলে উঠল, কি যে বলো। অদ্ভুত একটা হাসি অরিজিতেব কথাটাকে টুসকি দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে অরিজিৎ বললে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই ও তো বলছে ইমপসিবল। আমার জ্ঞানবুদ্ধিতেও যেটুকু বুঝছি····

তারপরই হেসে উঠে বললে, তোমার দুশ্চিন্তার কিছু নেই, আই অ্যাম নট দ্যাট আনসোশ্যাল, ওকে আগেই কংগ্র্যাচুলেট করে দিয়েছি।

কেমন একটা শূন্যতার মধ্যে দিয়ে পারমিতার কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, তাই বুঝি। অরিজিৎ গায়ে মাখল না। বরং পারমিতাকেই বোঝাবার জন্যে বললে, রামানন্দ বলছে থিওরেটিক্যালি ইমপসিবল্। আমি বলছি প্র্যাকটিক্যালি ইমপসিবল্।

পারমিতা হতাশভাবে অরিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, কিন্তু তোমবা তো ডাক্তার !

কথাটা খট্ করে কানে লাগল।

গতকাল রাত্তিরে কাঠের ক্যাশবাক্সো ভর্তি নোটের তাড়া নিয়ে গোপাল যখন ওপরে উঠে এল, এবং পিছনে পিছনে অরিজিৎ, নোটের রাশি গডরেজের লকারেব মধ্যে ঠেলে দিতে দিতে পারমিতা যখন খবরটা আবার বলল, তখনও ডাক্তার অরিজিৎ ব্যানার্জির কানে কেউ যেন ঠিক এই কথাটাই বলে উঠেছিল। তোমরা তো ডাক্তার !

একটা বিষাক্ত তীরের মত এসে কথাটা বুকের মধ্যে বিঁধেছিল।

২

বঙ্কিমবাবু সকালের কাগজেই খবরটা দেখলেন। তার আগে কেউ এসে বলেও যায়নি। টি ভি নেই, দেখার প্রশ্নও ওঠে না।

খবরটা দু-তিনবাব পড়ে ফেললেন, বেশ উত্তেজিত বোধ করলেন। ওঁর পঁয়ষট্টি বছরের ঢিমে তালের রক্ত হঠাৎ টগবগ করে উঠল। দারুণ একটা আনন্দ, যেন নিজেরই সাফল্য।

দীপঙ্কর, সেই দীপঙ্কর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছে। খবরটা কাগজে অবশ্য তেমন জোরালো করে বড় করে দেয়নি। ডিটেল্‌স্ কিছুই নেই। এসব খবর তো সত্যি খবর নয়, আজকাল এটা পলিটিক্সের যুগ। মন্ত্রীর ফিতে কাটা, ভিত্তি-প্রস্তর বসানো তার চেয়ে অনেক জরুরী।

বঙ্কিমবাবুর সারা শরীরে কিন্তু একটা উত্তেজনা খেলে গেল ঐটুকু খবরেই। দীপঙ্কর একটা কাজের মত কাজ করেছে। বঙ্কিমবাবু জানতেন ও একদিন কিছু একটা করে বসবে। পেরেছে, ও পেরেছে।

বঙ্কিমবাবু খাটে বসে বসে কাগজ পড়ছিলেন, সেখান থেকেই রান্নাঘরের দিকে চিৎকার ছুঁড়ে দিলেন, চা-টা একটু তাড়াতাড়ি দেবে ? একবার বেরোতে হবে।

স্ত্রী কোন জবাব দিল না, কিন্তু বঙ্কিমবাবু জানেন চা এসে যাবে। ওদিক থেকে কোন প্রশ্নও আসবে না, কোথায় যাবে এখন ? কারণ সকালের দিকে বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝেই বেরিয়ে যান। কারো ব্লাড নিতে।

উনি সরকারী হাসপাতালে প্যাথলজিস্টের চাকরি করেছেন, তারপর অবসর নিয়ে নিজেরই একতলার ঘরে একটা ক্লিনিক খুলে বসেছেন। নামেই ক্লিনিক।

বঙ্কিমবাবু ডায়েরির পাতা খুলে দেখে নিলেন, কারো কোন নির্দেশ আছে কিনা। চেনাজানা হাউস ফিজিশিয়ান দু-চারজন ওঁর ওপরই ভরসা রাখে। তাই আগের রাত্রে জানিয়ে দেয়, কিংবা চিঠি লিখে রুগীকে পাঠিয়ে দেয়। ব্লাড নিয়ে আসার জন্যে উনি লোক রাখেননি, নিজেই যান।

না, কোথাও যাবার নেই। সুতরাং দীপঙ্করের কাছেই যাবেন। ওর কাছে গিয়ে ওব সঙ্গে দেখা না করলে যেন শান্তি নেই।

দীপঙ্করের সঙ্গে চেনাজানা দীর্ঘকাল ধরে, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ কমই হয। বিটায়ারমেন্টের পর তো কারও সঙ্গেই আর দেখা হয় না। তবু এক একটা লোক আছে না, কিংবা এক ধরনের সম্পর্ক বছরের পর বছর দেখা নেই, কিন্তু দেখা হলেই মনে হয়, ঠিক যেখানটিতে ছেড়ে গিয়েছিলাম সেখান থেকেই শুরু হল। মাঝখানে যেন ফাঁক নেই। দীপঙ্করের সঙ্গেও ঠিক তেমনই। হয়তো ভিতরে ভিতরে একটা মিল আছে বলেই।

প্রথম জীবনে ট্রপিক্যালে কিছুদিন ছিলেন বঙ্কিমবাবু, সেই সময়ে একটা রোগ নিয়ে আসেন। তার ফলে চাকরিতে কোন উন্নতি হয়নি, চেষ্টাও করেননি।

অবসর নেবার পর যখনই কেউ ওঁকে বড় কোন ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত হতে বলেছে, কে কত টাকা রোজগার করছে তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে চোখেব সামনে, তখনই উনি হেসে হেসে বলেছেন, কিন্তু আমি যে ট্রপিক্যাল থেকে একটা ইনকিওরেব্‌ল ডিজিজ নিয়ে এসেছি সেই ছেলেবেলায়। আর ওসব হয় না হে, হয় না।

পাড়াপড়শিদের টুকটাক কাজ করেই ওঁর চলে যায়। এর ব্লাড ওর স্টুল। সুগার বাড়ল কিনা। দু-দশজন হাউস ফিজিশিয়ান ওঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। ওঁর ওপর আস্থা রাখে।

বঙ্কিমবাবু কিন্তু সুখী মানুষ। নীচেতলার ঘরেই ওঁর ক্লিনিক, কাজকর্মও কম। বাড়তি সময়টা কাটাবার মত একটা নেশাও আছে। দি ইনকিওরেব্‌ল ডিজিজ।

আসলে ট্রপিক্যালে গিয়ে হঠাৎ ওঁর মধ্যে একটা রিসার্চের নেশা ঢুকে গিয়েছিল। একটা কিছু করতে হবে, একটা কিছু আবিষ্কার করবেন। এখনো অভ্যাসবশেই সে-সব নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

স্ত্রী চা দিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে কাপটা নিয়ে বেশ হাসি হাসি মুখে বললেন, একটা

দারুণ খবর আছে। দীপঙ্কর রায়....

খবরের কাগজটা এগিয়ে দিলেন, জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখালেন।

পরক্ষণেই একটু ক্ষুণ্ণ হলেন, স্ত্রী চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে খবরটুকু পড়ে শুধু একটা 'হুঁ' বলে চলে গেল দেখে।

মনে মনে হাসলেন। ওর তো এ-সবে কোনওকালেই কোনও আগ্রহ ছিল না। কোন ব্যাপারটার কতখানি গুরুত্ব বোঝে না।

তারপর নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছেন, কে বোঝে ?

প্যান্টে বেল্ট এঁটে গায়ে কোট চাপিয়ে বঙ্কিমবাবু বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি নেই, গাড়ি ওঁর ছিলও না। এখন তো পেনশন সম্বল। টুকটাক ব্লাড-ইউরিন করে কতই বা হয়।

হাঁটতে হাঁটতে এসে বাস স্টপে দাঁড়ালেন। তাড়াতাড়ি না পৌঁছতে পারলে দীপঙ্কর হয়তো বেরিয়ে যাবে। কে জানে, আজ সকালেই হয়তো ওর ওখানে বহু লোক ভিড় করবে, আর দীপঙ্কর সেই ভয়ে সরে পড়বে। ওর ধরন-ধারন চিরকালই একটু পাগলাটে।

কিন্তু বাস আসতে খুব দেরি হচ্ছে।

বঙ্কিমবাবু বেঁটেখাটো মানুষ, তবে বেশ স্বাস্থ্যবান। গায়ের রঙ কালো, সামনের দিকে চুল উঠে গিয়ে কপাল বড় হয়ে গেছে। কেউ সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দিব্যি নিজেকে নিয়ে রসিকতা করে বলেন, টাকই কপাল অবধি নেমে এসেছে, কপাল আর বড় কোথায় হল হে।

—কপাল বড় করার আপনি তো চেষ্টাও করলেন না। কেউ হয়তো সমবেদনা জানিয়ে বলেছে।

উনি হেসেছেন, কোন উত্তর দেননি। কপাল বলতে এরা কি বোঝে তা তো অনেককাল আগেই জেনে গেছেন।

ইতিমধ্যে বাস এসে গেল, বঙ্কিমবাবু উঠে পড়লেন। এত সকালে তেমন ভিড় নেই, কিন্তু বসার জায়গাও নেই।

বঙ্কিমবাবু ভেবেছিলেন দীপঙ্করের ব্যাপার নিয়ে বাসে কেউ না কেউ আলোচনা করবে। এমন একটা খবর। কিন্তু না, কেউই কিছু বলছে না। হয়তো কাগজই পড়েনি।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ শুনতে পেলেন পিছনে কন্ডাক্টরের সঙ্গে কে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছে।

কখন টিকিট কেটেছেন, কখন ঠিক গন্তব্যে পৌঁছতেই বাস থেকে নেমে পড়েছেন, সচেতন হয়ে উঠতেই অবাক হয়ে গেলেন। আসলে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

বঙ্কিমবাবু বহুকাল আগেই জেনে গেছেন ওঁর দ্বারা কিচ্ছু হবে না। তার জন্যে এখন আর ক্ষোভ নেই। এখন বুকের মধ্যে নৈসর্গিক আনন্দ খেলে যাচ্ছে। দীপঙ্কর পেরেছে।

উনি যা খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে কোনও মিল নেই, পদ্ধতি পন্থা এক নয়, তবু কোথায় যেন একটা মিল আছে। অন্তত বঙ্কিমবাবু তাই অনুভব করেন। শুধু দীপঙ্করের সঙ্গে নয়। যারাই খুঁজছে তাদের সঙ্গে কেমন একটা আত্মীয়তা বোধ করেন।

—মানুষের একটাই ধর্ম, বুঝলে হে। খোঁজা। মনে পড়ছে, দীপঙ্করকে একদিন বলেছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, সবাই খুঁজছে। বেশির ভাগই টাকা খোঁজে। গাড়ি-বাড়ি সুখ। কত লোক শুধুই ভগবান খুঁজে গেল। খুঁজুক না হে, যে যা চায়। কিন্তু মানুষের আসল গর্ব, যে আরেক ধরনের মানুষ আছে, যারা পথ খুঁজছে। পথ আবিষ্কার করছে, আরও কিছু জানার পথ। এই যেমন তুমি....

বলেই অট্টহাস্যে হেসে উঠেছেন। কেমন চমৎকার একটা বক্তৃতা দিলাম বলো, প্রায় মন্ত্রীদের ভাষণ। তাই না ?

দীপঙ্করের মধ্যে এই সব উত্তেজনা, ইমোশন একটুও নেই। আর সেজন্যেই ও হয়তো

শেষ অবধি পেরেছে।

বাস স্টপ থেকে বেশ কিছুটা হেঁটে গিয়ে দীপঙ্করের বাড়ি। ছোট্ট দোতলা বাড়ি, অনেককালের। ওঁর বাড়িটার মতই পুরনো। পুরনো দিনের ভাড়াটে বলেই ভাড়া কম। এটা না থাকলে তো কবেই কলকাতার বাইরে চলে যেতে হত। আসল মানুষগুলো তো এভাবেই বাইরে চলে যাচ্ছে, যেখানে না-আছে ল্যাবরেটরি, না বইপত্তর। পরামর্শ করার মত দুটো বিজ্ঞ লোকও পাওয়া যায় না সেখানে। জীবন বসু মল্লিকের মত একটা ব্রাইট ছেলে এভাবেই তো শেষ হয়ে গেল। যারা শুধুই টাকা খোঁজে, এ-শহর এখন শুধু তাদের জন্যে। ব্যবসায়, প্রফেশনে, চাকরিতে এখন সকলে শুধুই টাকা খুঁজছে।

সেদিক থেকে বঙ্কিমবাবু নিজেও ভাগ্যবান। বাড়িটা খুবই পুরনো, দেয়ালে নোনা ধরা, কিন্তু ভাড়া খুবই কম। সেই চল্লিশ বছর আগেকার ভাড়া। মাঝে সামান্য বেড়েছে। বাড়িওয়ালা আর চুনকাম করায়নি। এই ভাড়ায় হোয়াইটওয়াশ! স্ত্রীর কথা শুনে উনি নিজেই হেসেছেন। নিজেও অবশ্য পারেন না। এই তো সামান্য পেনশন, মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন, দু-চারটে ব্লাড-ইউরিনে ক-টাকাই বা হয়।

বঙ্কিমবাবু এসে কড়া নাড়লেন। দীপঙ্কর আছে তো? উনি তো ভেবেছিলেন ইতিমধ্যে অনেকেই এসে গেছে। ওকে অভিনন্দন জানাতে। মনে মনে স্তোক দিলেন, এত সকালে কি করেই বা আসবে, আজকাল সবাই তো ব্যস্ত। হয়তো দেরিতে আসবে।

দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তেই দীপঙ্কর নিজেই দরজা খুলে দিল। বঙ্কিমবাবুকে দেখেই হেসে উঠল, একটু অবাকও হল। কিন্তু তার আগেই দু হাত বাড়িয়ে দীপঙ্করকে জড়িয়ে ধরেছেন উনি।—ইউ হ্যাভ ডান এ গ্রেট জব, দীপঙ্কর! তুমি আমাদের সম্মান বেখেছো।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, স্যার, আপনি এই সকালে ছুটতে ছুটতে আসবেন, আমি ভাবতেই পারিনি। আমি যেতাম, আপনার কাছে যেতাম।

বঙ্কিমবাবু কপট রাগে বললেন, মিথ্যে কথা বলো না দীপঙ্কর, তুমি যে কি নিয়ে রিসার্চ করছো তাই জানতে দাওনি। অবশ্য ভালই করেছিলে।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে চেয়ার টেনে দিল। বসুন, বসুন।

তারপর নিজেও বসল। বললে, খবরটাও, স্যার আমি দিইনি। আমাব এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রথম থেকে সে সবই জানত, আনন্দের চোটে তাকে বলে ফেললাম···

দীপঙ্কর হাসতে শুরু করল। মানুষটা তখন যেন একটা খুশি আর আনন্দের ফোয়ারা।

তারপরই চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলো, সীমা, সীমা! কে এসেছেন দেখে যাও।

সীমা ডাক শুনে দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে কে এসেছেন দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। ওমা, আপনি? আসুন, আসুন।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, আমি তো ভেবেছিলাম ছাত্রটাত্র হবে কেউ, গুরুই এসে হাজির।

দীপঙ্কর হাসল।

—ও নো নো। বঙ্কিমবাবু হাত তুলে বাধা দেওয়ার ভঙ্গি করলেন। বললেন, দীপঙ্কর 'স্যার' বলে ঐ আমার যথেষ্ট সম্মান। গুরুটুরু বলো না, ঠাট্টার মত শোনাবে।

দীপঙ্কর প্রণামটনাম করতে পারে না, ওসব ভণিতা ওর ভালও লাগে না। ও হাসতে হাসতে বললে, খুব একটা বাড়িয়ে বলেনি স্যার, আপনার কাছে কিছু না কিছু প্রশ্ন নিয়ে তো গিয়েছি।

বঙ্কিমবাবু সীমার মুখের তৃপ্তির হাসিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ঠিক এই হাসিটাই কোনও দিন ওঁর স্ত্রীর মুখেও দেখতে পাবেন আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন, ওঁর জীবনেও একটা সাকশেস কোনও দিন দেখা দেবে, আর

তখন এই সারাজীবনের গ্লানি, অভাব, ব্যাখ্যাহীন একটা ইনকিওরেব্‌ল ডিজিজ বয়ে বেড়ানোর জন্যে যা-কিছু ক্ষোভ স্ত্রীর মন থেকে মুছে যাবে। সেও ঠিক এই সীমার মতই তৃপ্তিতে আনন্দে হাসতে পারবে।

—চা নিয়ে আসি। সীমা চলে গেল।

অন্যমনস্কতা থেকে সরে এসে বঙ্কিমবাবু বললেন, তুমি আমার লাইফটাকে জাস্টিফিকেশন দিয়েছো দীপঙ্কর, সেটাই তো গর্ব। গুরুটুরু বলো না।

কি যেন ভাবলেন বঙ্কিমবাবু, থেমে থেমে বললেন, ইট্‌স্ দি ক্যারেকটার। তুমি একটা জিনিস খুঁজেছো, এবং পেয়েছো। আমিও খুঁজেছি, পাইনি। আমি অবশ্য অন্য কিছু খুঁজেছি। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু ক্যারেকটারের কথাটা তুমি ভাবো। পেনিসিলিন আবিষ্কার করার আগের দিন যদি অ্যালেকজান্ডার ফ্লেমিং মারা যেতেন, সেই চরিত্রটাও কিন্তু সমান শ্রদ্ধার।

দীপঙ্কর ধীরে ধীরে বললে, একজ্যাকটলি সো। সীমা আপনাকে গুরু বলে ভুল কিছু বলেনি। হাসতে হাসতে বললে, আপনি বয়স্ক বলে গুরু বলেছে, সমবয়স্ক হলে বলত বার্ডস অফ দি সেম ফেদার।

বঙ্কিমবাবু বললেন, ক্রেডিট কিন্তু সীমারও প্রাপ্য। এমন স্ত্রী না হলে·····

এই সময়েই চা নিয়ে এল সীমা। ওঁদের কথাটা শুনতে পেয়ে বললে, বিয়ের সময় কিন্তু একবারও বলেনি, এত ছেলেমেয়ে আছে মানুষ করতে হবে।

এটা পুরনো রসিকতা, বঙ্কিমবাবুও হেসে উঠলেন। বললেন, চলো চলো তাদের একবার দেখে আসি।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে বুকের মধ্যে খিচখিচ করে লাগছিল বঙ্কিমবাবুর। উনি তো ভেবেছিলেন সকাল থেকে ভিড় লেগে যাবে দীপঙ্করের বাড়িতে। প্রচুর লোকের সঙ্গে তো ওর জানাশোনা। ও একটু মিশুকে ধরনের। তারা তো আসবে! কিন্তু কই! না লোক আসছে অভিনন্দন জানাতে, না টেলিফোন।

নিজের ওপরই সন্দেহ জাগল বঙ্কিমবাবুর। তাহলে কি সত্যি এ-সবের কোনও মূল্যই নেই? এই যে একটা কিছু খুঁজে বের করার পিছনে সারাটা জীবন উৎসর্গ করা, বছরের পর বছর লেগে থাকা, এর কোনও বৈষয়িক মূল্য নেই সেটুকুই উনি জানতেন। কিন্তু সম্মান?

মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, আমি তো ভেবেছিলাম হে, অনেকেই আসবে তোমাকে কংগ্র্যাচুলেশনস জানাতে।

হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল দীপঙ্কর। বললে, কয়েকজন অবশ্য টেলিফোনে জানিয়েছেন।

তারপরই হাসতে হাসতে বললে, স্যার, আমি তো একটা সামান্য সরকারী ডাক্তার। চাকরি নিয়েই তটস্থ। আমার কাছে কে আর আসবে বলুন। হেসে উঠে বললে, অবশ্য বন্ধুরা আসে।

বঙ্কিমবাবু আর কোন কথা বললেন না। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। দীপঙ্করের ছেলেমেয়েদের। দেয়াল ঘেঁসে কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট কাঠের জালের ঘর। কোনওটায় খোপে খোপে ইঁদুর, ব্রাউন মাইস, কোনওটায় গিনিপিগ। খরগোশও। ভিতর দিকে একটা উঠোন। মেঝের সিমেন্ট ফেটে গিয়ে উঠোন জুড়ে মানচিত্র হয়ে আছে। একপাশে করবী গাছে চেন দিয়ে বাঁধা দুটি বানর শিশু। রিসাস।

বঙ্কিমবাবু দেখেই হেসে ফেললেন।

ওঁর হাসি দেখে সীমা এগিয়ে এল। হাসতে হাসতেই বললে, জানেন তো, আমার আত্মীয়স্বজনরা সবাই জানে ও একটা বদ্ধ পাগল। যারাই এ বাড়িতে এসেছে, দেখে গিয়ে

বাবাকে বলেছে কার হাতে দিলে মেয়েটাকে।

সীমা হেসে হেসে বলছিল।

বঙ্কিমবাবু অবাক হয়ে তাকালেন সীমার মুখের দিকে। বললেন, তুমি তো এক্সপ্লেন করে দেবে হে, তোমার স্বামী একজন সায়েন্টিস্ট। ডাক্তার নয়।

সীমা ঠোঁট উলটে বললে, তাহলে তো আরও হাসত, আমাকেও পাগল ভাবত।

বঙ্কিমবাবু নিজের মনেই যেন বললেন, তা ঠিক তা ঠিক।

দীপঙ্করকে বেশ খুশি-খুশি লাগছিল, লাগবারই কথা। ও বললে, চলুন স্যার আমার ল্যাবরেটরিটা দেখবেন। তা ছাড়া ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন। হেসে বললে, বোঝানোর মত লোকও তো কম।

বঙ্কিমবাবুকে নিয়ে দোতলায় উঠে এল দীপঙ্কর। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, পেপার রেডি করাই হয়নি এখনো।

তারপর বেশ যেন অভিমানের স্বরে বললে, আগে একটা পেপার ছাপা হল, এখানে কেউ কিছু ইম্পর্ট্যান্সই দিল না। আমার তাই জেদ চেপে গিয়েছিল।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, অথচ দেখুন স্যার, সারা পৃথিবী এই রোগটা নিয়ে ভাবছে। হাজার হাজার বছব ধরে মানুষকে জ্বালিয়েছে যে রোগটা···

বঙ্কিমবাবু বললেন, সেজন্যেই তো ছুটে এলাম হে, তুমি একটা অসাধ্যসাধন করেছ।

ল্যাবরেটরি বলতে কিছুই নয়। দুখানা টেবিল পাশাপাশি জুড়ে তাব ওপর নানা মাপেব কাচের টিউব আর পাত্র, এক কোণে গ্যাস সিলিন্ডাব। টেবিলে একটা বুনশেন বার্নার। সাবি সারি একরাশ টেস্টটিউব, একটা মাইক্রোস্কোপ, বেশ কিছু বিকার আর ডিস্ক। টেবিলের সামনে একটা গোল টুল।

এরই মধ্যে সীমা কখন পিছনে দাঁড়িয়েছে। হেসে বললে, ব্যস এই।

বঙ্কিমবাবু ফিরে তাকিয়ে বললেন, আবিষ্কার ঐ কাচের টিউব করে না হে, করে এই জিনিসটি। বলে নিজের মাথায় আঙুল ঠুকে দেখালেন।

সীমা হেসে হেসে বললে, কিন্তু এ দেখে কেউ বিশ্বাসই কববে না।

বঙ্কিমবাবু বললেন, তবে তুমি অবশ্য ঠিকই বলছ, বড় গাড়ি আর মোটা ফি না হলে বড় ডাক্তার হয় না। তেমনি অনেক বিলিতি ডিগ্রি আর ইয়াব্বড় ঝকঝকে ল্যাবরেটবি চাই।

দীপঙ্কর হেসে উঠল। সীমাও।

বঙ্কিমবাবু বললেন, ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো হে, দেখি বুঝতে পারি কি না।

দীপঙ্কর হাসল।—আপনি বুঝবেন, কারণ আপনি তো বুঝতে চাইছেন।

সারি সারি সাজানো টেস্ট টিউবের মাঝ থেকে একটা তুলে নিয়ে দেখাল, ভিতরের তরল পদার্থটি নেড়ে বললে, এটাই আসল। দিস ইজ এক্সোন। পঁয়ত্রিশ বছর আগে অস্ট্রিয়ার ডক্টর আল্‌টম্যান একটা রিপোর্ট ছেপেছিলেন।

বঙ্কিমবাবু অবাক হয়ে বলে উঠলেন, তাই নাকি হে?

দীপঙ্কর বললে, হ্যাঁ, কিন্তু কমপ্লিট করে যেতে পারেননি। পার্সেন্টেজ অফ সাকসেস ছিল কম।

বঙ্কিমবাবু অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু কাজটা কি? ইনকিউবেশন?

দীপঙ্কর বললে, ব্রাউন মাইসে তিনি রোগ সৃষ্টি করতে পারেননি, কিন্তু দেখেছিলেন তাদের কয়েকটা বাচ্চার ও রোগ হয়েছিল। বাট নো ওয়ান টুক নোটিস অফ ইট। কারণ, আল্‌টম্যান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মারা যান।

একটু থেমে বললে, রোগটা আপনি জানেন হেরিডিটারি নয়। আমি এক্সোনের সঙ্গে একটা হরমোন মিশিয়ে ব্যাসিলিকে গ্রো করাতে পারলাম, এবং সেটাই আমার ভ্যাকসিনের

চাবিকাঠি। ইনকিউবেশন পিরিয়ডকে ছোট করে আনতে আমি এটা ট্র্যান্সমিট করলাম মাদার টু চাইল্ড। রোগটার জন্যে যখনই একটা হোস্ট পাওয়া গেল, তখন সবই তো সোজা।

বঙ্কিমবাবু তারিফের ভঙ্গিতে বললেন, গ্র্যান্ড আইডিয়া।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, স্টেরিলিটি থাকলে, মানে বন্ধ্যার ক্ষেত্রে কি হবে দেখতে গিয়ে, মজার ব্যাপার, কয়েকটা তেমন রিসাস মাঙ্কিকে ব্রিড করানোর পর একটার বাচ্চা হল। জানি না, ঐ হর্মোনটার জন্যেই হয়তো। গোনাডোট্রপিন।

একটু থেমে বললে, স্যার, এদিকটা নিয়ে আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখুন না।

বঙ্কিমবাবু হেসে বললেন, আমার কি আর সে-বয়েস আছে হে!

এই সময়েই নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। সীমা ছুটে চলে গেল, দেখি কেউ বোধহয় এসেছেন।

দীপঙ্করের ওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, গবেষণার বিষয়টা ও বোঝাতে শুরু করল বঙ্কিমবাবুকে। আমি যদি একটা ট্যাবলেট আবিষ্কার করতাম, অ্যাজ এ কিওর, দেখতেন ভিড় লেগে যেত ব্যবসাদারদের। কিন্তু সেই যে ছেলেবেলায় পড়েছিলাম প্রিভেনসন ইজ বেটার দ্যান কিওর....

সীমা উঠে এল হাতে একটা খাম নিয়ে। সরকারী ছাপ মারা।

বললে, লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।

দীপঙ্কর হাসি-হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে নিল খামটা। বললে, বোধহয় হেল্‌থ মিনিস্টার কংগ্র্যাচুলেশনস জানিয়েছেন। প্রয়োজনের সময় এতটুকু সাহায্য না পেলে কি হবে সাকশেসফুল হলেই.....

খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে গিয়ে কথা থেমে গেল দীপঙ্করের। একটা আনন্দের খবর আশা করে হঠাৎ অখুশি হবার মত কিছু শুনলে যেমন হয়, ওর মুখের ভাব বদলে গেল।

সীমা বলে উঠল, কি হল? বলেই চিঠিটা টেনে নিল।

তারপরই বললে, ও।

অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির চিঠি। দশটার সময় গিয়ে দেখা করতে হবে রাইটার্সে।

দীপঙ্কর বিচলিত বিরক্তিতে বললে, এই সব দেখা করা-টরা আমার একদম পোসায় না। সেই গিয়ে ধর্না দেওয়া, এর কাছে ওর কাছে, দিব্যি শুনতে পাচ্ছি খোশ গল্প হচ্ছে, পি এ বলবে উনি বিজি, কিংবা কনফারেন্সে আছেন....

বঙ্কিমবাবু হাসতে হাসতে বললেন, যস্মিন দেশে যদাচার হে, করবে কি। আমার আর চিন্তা নেই, ওদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেছি।

দীপঙ্করকে দশটার মধ্যে রাইটার্সে হাজির হতে হবে। সরকারী চাকরি একমাত্র জীবিকা হলে ওসব নির্দেশ মানতে হবেই। তুমি যত বড় জিনিয়াসই হও!

বঙ্কিমবাবু বললেন, তাহলে আর তোমার সময় নষ্ট করব না।

চলে গেলেন।

দীপঙ্কর আর সীমা বাড়ির দরজা অবধি এসেই ক্ষান্ত হল না, ওঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিল।

আর ফেরার পথে দীপঙ্কর বললে, লিখেছে টু এক্সপ্লেন সার্টেন পয়েন্ট্‌স্। কি ব্যাপার বুঝছি না।

কাল থেকেই সীমার মন এমন একটা আনন্দে ভরে আছে যে ও অন্য কিছু ভাবতেই পারছে না। তাই বলে উঠল, ও কিছু না, হয়তো দেখবে এখন অনেক খাতির করবে।

দীপঙ্কর চেষ্টা করে হেসে উঠল। আসলে এই চিঠিটার মধ্যে কোথায় যেন একটা

অসম্মান লুকিয়ে আছে। সীমা তো শিক্ষিত মেয়ে, বুঝতে নিশ্চয়ই তার অসুবিধে হয়নি। দীপঙ্করের খারাপ লাগবে বলে না বোঝার ভান করছে।

কাল থেকেই দীপঙ্কর অস্বস্তির মধ্যে আছে। কেমন একটা নার্ভাস নার্ভাস ভাব। সকলের দৃষ্টি ওর ওপর এভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়বে ভাবতেও পারেনি।

ও তো এতদিন নগণ্য হয়েই ছিল। নিতান্তই আলাপ-পরিচয়ের ফলে দু-একটা উঁচু মহলে নিমন্ত্রিত হয়েছে, হাসি-আড্ডায় সময় কাটিয়ে চলে এসেছে। ওকে নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা ছিল না। সবাই জানত ও বেশ মজার মানুষ, একটু পাগলাটে এই যা।

আসলে রিসার্চের ব্যাপার ও যথাসম্ভব গোপন রেখেছিল। না রেখেই বা উপায় কি। প্রথম যখন শুরু করেছিল, সুবিধে হবে মনে করে সামান্য একটা ট্র্যান্সফার চেয়েছিল। কেউ বিশ্বাসই করেনি, কেউ কেউ মুখ টিপে হেসেছে। শেষে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে একদিন বড়বাবু ধরনের একজন ক্লার্কের সঙ্গে ঝগড়া করে ফেলল রেগে গিয়ে। আর মাসখানেকের মধ্যেই ওকে বদলি করে দিল পাহাড়ি জংলা গ্রামে। সব আশা-ভরসা চলে গিয়েছিল দীপঙ্করের।

অনেক চেষ্টায় আবার ফিরে আসতে পেল। এক বছর পরে।

সরকারী ঐ আমলাদের দোষ দিয়েই বা লাভ কি! সমস্ত পরিবেশটাই তো এ-রকম। এর মধ্যেই টিঁকে থাকতে হবে, কিছু করার ইচ্ছে হলে এরই মধ্যে করতে হবে। ঢেউ থামলে সমুদ্রে স্নান করব ভাবলে তো স্নান করাই হবে না। আর আমাদের এই গলা পচা সমাজে কাজ করতে হলে বিছুটির কম্বল গায়ে দিয়ে দিয়েই করতে হবে।

ওর মধ্যে আগে একটা প্রচণ্ড আবেগ ছিল, কখনো কখনো বলে ফেলত, আর তা শুনে ওর ডাক্তার বন্ধুরাও হাসত। সবচেয়ে আশ্চর্য, একজন সিনিয়র দীপঙ্করকে অপছন্দ করত বলেই হোক, অথবা ঈর্ষা, ওর অসুবিধে সৃষ্টি করে গেছে নানাভাবে।

সীমা হেসে ফেলল একটা কথা মনে পড়তে।

—তোমার মাসীমা কিন্তু আসবে না। সীমা হাসতে হাসতে বললে।

দীপঙ্কর উত্তর দিল, না এলেই ভাল।

গতকাল রাত্তিরেই দু-একজন এসেছে খবর শুনে। সীমার দিদি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে এসেছিল, হাতে মিষ্টি। এসেই বলেছে, তোদের আর একটুও বিশ্বাস করি না। এত বড় একটা কাণ্ড করছিল দীপঙ্কর, একটা দিনের জন্যেও জানতে দিসনি!

তখন তাকেও গল্পটা বলতে হয়েছে।

দীপঙ্করের ছোটমাসী একসময় বেড়াতে আসতেন মাঝে মাঝে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে। কারও কিছু অসুখবিসুখ হলে দেখিয়ে যেতেন, টুকটাক ওষুধও দিয়ে দিত দীপঙ্কর।

তারপর হঠাৎ এক বিয়েবাড়িতে দেখা। সে কি রাগ ছোটমাসীর। অপরাধের মধ্যে দীপঙ্কর বলে ফেলেছে, আর যাও না কেন?

ছোটমাসী রেগে গিয়ে বললে, আমি যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতাম তোর বাড়িতে, বলবি তো একদিন, খারাপ রোগ নিয়ে তুই কি-সব করছিস, বললেও তো পারতিস ছেলেমেয়েদের এনো না।

সে কথা মনে পড়তেই সীমা হেসে ফেলল।

এখন হাসতে পারছে। সেদিন কিন্তু মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হাসতে পারেনি, উত্তর দিতে পারেনি। উত্তর দিতে ইচ্ছেও হয়নি। রাগ আর ঘৃণায় ভিতরটা জ্বলছিল। ছোটমাসীকে দোষ দিয়ে কি হবে, সমস্ত দেশটাই তো এই রকম মূর্খ মানুষে ভরে আছে।

বাড়ি ফেরার সময় সীমা চাপা ক্ষোভের স্বরে বলেছিল, ওরা যে সকলে আমাদের একঘরে করে দিয়েছে জানতাম না।

যে রোগটা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে ভয় দেখিয়ে এসেছে, মানুষেব জীবন নষ্ট

করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাকে সমাজের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, দীপঙ্কর তখন স্বপ্ন দেখছে সেই রোগটাকে পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দেবে। ভাবতেই পারেনি, সমাজ ওকেই ছেড়ে চলে যাবে।

ছোটমাসীর কথাটা তখনও দীপঙ্করের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করছে। ও সীমার কথায় কোন সাড়া দিল না।

সীমা অনুযোগের গলায় বললে, তোমারই তো দোষ, তোমার বড়মামাকে সেদিন বলে না ফেললে তো আর জানতে পারতেন না।

দীপঙ্কর কি করবে, মানুষ সব সময়ে কি তার ভেতরের চাপা আবেগ আগলে আগলে রাখতে পারে। তাছাড়া এই সব দিক ভেবে তো আর ও গোপন করতে চায়নি। ওর ওপর কারও আস্থা নেই, ও যে সত্যি বড় কিছু একটা করে ফেলতে পারে কেউ বিশ্বাস করে না, তাই গোপন করে এসেছে। শুনে হাসবে সকলে, এই ভেবে। আসলে যারাই কিছু একটা আবিষ্কার করে বসেছে, তার আগের দিন পর্যন্ত তো সকলে তাকে অতি সাধারণ মানুষ বলেই মনে করে। কেউ হাসে, কেউ পাগল ভাবে, কেউ উপদেশ দেয়, ভবিষ্যৎ ভাবতে বলে। ভবিষ্যৎ মানে অর্থ-সম্পদ, বাড়িঘর, প্র্যাকটিস জমানো, চাকরিতে উন্নতি।

ডাক্তার সান্যাল একদিন হাসতে হাসতে বলছিলেন, ফি বাড়িয়ে দিলাম দীপঙ্কর। এখন ছুরি ধরলেই হাজার টাকা। আমি একটু ভিড় কমাতে চাই, বুঝলে। আই অ্যাম ড্যামন্‌ড্ টায়ার্ড।

দীপঙ্কর সেদিন ওর এক চেনাজানা পেশেন্টকে নিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন মানুষটাকে ওর খুব ছোট মনে হয়েছিল। সার্জেন হিসেবে যত অসাধারণই হোন, মানুষ হিসেবে ছোট।

কিন্তু ছোটমাসীর কথাটা শুনে মনে মনে ক্ষমা করে দিয়েছিল ডাক্তার সান্যালকে। ওরা বোধহয় ঠিকই করে। কিংবা ওরা নিজেরা ছোট হতে চায় না, চারপাশের এই সমাজই ওদের ছোট করে দিচ্ছে।

ট্যাক্সির এক কোনায় গা এলিয়ে দিয়ে দীপঙ্কর বললে, দোষ ছোটমাসীর নয় সীমা, দোষ ওদের অজ্ঞতার।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, ভয় পাওয়াও তো স্বাভাবিক। জানো না, প্রথম যখন বাধ্য হয়ে ঐ ডিপার্টমেন্টে পোস্টেড হলাম, এত তো বই পড়া বিদ্যে ছিল, তবু সাতটা দিন আমি ঘুমোতে পারিনি। সায়েন্স যতই যুদ্ধ করুক, কুসংস্কারকে জয় করা সত্যি খুব কঠিন সীমা।

রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাবার পথে সেই কথাগুলো মনে পড়ল দীপঙ্করের।

এখন দীপঙ্কর সাকশেসের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। এত বছর ধরে যা খুঁজছিল, তা এখন ওর হাতের মুঠোয়। সে-সব দিনের কথা মনে পড়লে এখন ওর হাসি পায়। সেই বড়বাবুর হুমকি, ছোটমাসীর অভিযোগ, ডাক্তার সান্যালের ঠাট্টা, ডাক্তার ব্যানার্জির উপদেশ।

তবু বুকের মধ্যে খিচখিচ করে লাগছে একটা অভব্য চিঠি। 'টু এক্সপ্লেন সার্টেন পয়েন্টস।'

ঠিক দশটায় গিয়ে হাজির হতে হবে। হয়তো একজন কেরানীর সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে। অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির খোশ গল্প কানে আসবে। 'উনি এখন বিজি, কনফারেন্সে আছেন।'

এসব গ্লানি এখন দীপঙ্করের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। ও জেনে গেছে ভবিষ্যতের পৃথিবী ওর নাম মনে রাখবে। একটা কুৎসিত রোগ তিনি পৃথিবী থেকে নির্মূল করে গেছেন।

৩

দীপঙ্করের নিজেকে বড়ো অসহায় লাগছিল।

জীবনের সমস্ত গ্লানি আর অপমান ও ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর নতুন কোন অপমানের কথা ও ভাবতেই পারছে না।

এখন টিকে থাকাটাই বড় কথা।

পেপারটা এখনো তৈরি হয়নি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওটা লিখে পাঠাতে হবে বাইরের কোন জার্নালে। তারপর স্বীকৃতি।

হঠাৎ মনে হল অমূল্য ওর উপকার করতে গিয়ে যেন ওর ক্ষতি করে দিয়েছে। অতখানি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওর কাছে সব বলে ফেলা উচিত হয়নি। ও যে একটা নিউজ এজেন্সির রিপোর্টার তা মনে ছিল না। নাকি মনে ছিল, ঐ মুহূর্তে একটা দুর্বলতা উঁকি দিয়েছিল। সকলে জানুক, আমি পেরেছি।

—আফটার অল আপনি একজন গাভমেন্ট সার্ভেন্ট। গাভমেন্টের চাকরি করতে হলে তার নিয়মকানুনও আপনার জানা উচিত।

টেবিলের ওপর থেকে পেপারওয়েটটা তুলে নিয়ে লোকটার মুখের ওপব ছুঁড়ে মাবতে ইচ্ছে হয়েছিল দীপঙ্করের। অথবা রেজিগনেশানের চিঠিটা।

পরমুহূর্তেই বুকের ভিতর থেকে কে যেন ওকে বলে উঠল, শান্ত হও। তাই দীপঙ্কর বিভ্রান্ত মুখে বললে, নিয়মকানুন!

—যাক সে-কথা বাদ দিন। লোকটি এবার হাসল। বললে, আপনি যদি একটা ভাল কাজ করে থাকেন, গাভমেন্ট নিশ্চয় আপনার এগেনস্টে কোন স্টেপ নেবে না।

হাসতে হাসতে বেশ একটা মুরুব্বি চালে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বেব কবল লোকটা, টেবিলে দুবার ঠুকল, তারপর ঠোঁটে গুঁজে দেশলাই জ্বালল, ধরাল।

—আপনার ওভাবে প্রেসের কাছে রাশ করা উচিত হয়নি।

এই রাতারাতি বিখ্যাত হওয়া, ওকে নিয়ে আলোচনা এবং আলোড়ন, এ-সবে তো অভ্যস্ত নয়, কখনো কল্পনাও করেনি। একটা কিছু খুঁজছি। খুঁজে পাওয়ার নেশাটাই ছিল। তারপর কি হবে, কি হতে পারে তা ভাবেইনি।

সেজন্যে নিজেরই মনে হয়েছিল অমূল্যকে কথাটা না জানালেই হত।

কিন্তু এই লোকটা সে-কথা বলার কে! এটা তো আবিষ্কার, এটা কি সরকারী ফাইলের কোন গোপন খবর।

ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হচ্ছিল দীপঙ্কর। ও অধৈর্য হয়ে জিগ্যেস করল, উনি কি আসেননি এখনো? আমার আবার অনেক কাজ আছে।

—আসবেন, আসবেন। লোকটা যেন সান্ত্বনা দিল। এমন ভঙ্গিতে বললে. যেন দীপঙ্কর প্রার্থী হয়ে এসেছে তাঁর কাছে। যেন সেই প্রথম জীবনের অসহায় ভাব নিয়ে এসেছে দূরের মফস্বলে ট্র্যান্সফার রদ করাতে, কিংবা ইচ্ছেমত ডিপার্টমেন্টে যাবার অনুরোধ নিয়ে।

লোকটি হঠাৎ বললে, আপনারা এক একটা কাজ করে বসেন....জানেন, মিনিস্টার কাল রাত্রেই সেক্রেটারিকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন.....আপনি যদি হসপিটালের ডাক্তার না হতেন, মানে, গাভমেন্ট সার্ভেন্ট না হলে তো কিছু বলার ছিল না।

দীপঙ্কর ততক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছে। আসলে ব্যাপারটা তা হলে এই। মিনিস্টার খবর শুনেই জানতে চেয়েছেন আরও কিছু ডিটেল্‌স্। হয়তো কৌতূহলবশেই। অথবা চিফ মিনিস্টার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন বলেই তিনি জানতে চেয়েছেন সেক্রেটারি বা ডিরেক্টরের কাছে। কিন্তু দীপঙ্কর লোকটা কে! সে তো একজন নগণ্য ডাক্তার,

গণ্যমান্যদের অনেক নীচের ধাপের একজন সাধারণ মানুষ। সরকারের গোলাম। ওর চেয়ে কত উঁচু ধাপের মানুষকেও এখানে এসে দরবার করতে হয়, প্রয়োজনে। সেজন্যেই অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির চিঠি।

তিনি এলেন। প্রশ্ন করলেন, একটা শুকনো কংগ্র্যাচুলেশন্‌স্ জানানোব পরই।

না, এখন আর কিছুই বলার নেই দীপঙ্করের।—যেটুকু বলার তা তো কাগজেই বেরিয়ে গেছে। আপাতত আর কিছু বলতে পারছি না।

—তাহলে চলুন, একবার সেক্রেটারির কাছে।

সেক্রেটারি, ডিরেক্টর, মিনিস্টার—এসব কিছুই বুঝতে চায় না দীপঙ্কর। সকলের কাছেই ঐ একই কথা।—আই হ্যাভ নাথিং টু অ্যাড।

ফেরার সময় সেই লোকটা দাঁতে কাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে করিডর অবধি এল। বললে, ভুল বুঝবেন না ডক্টর রায়, আপনার জন্যে আমবা খুব গর্বিত, আজ তো চতুর্দিকে শুধু আপনারই আলোচনা। কিন্তু কাজটা খুব ভাল করলেন না।

কাজটা যে খুব ভাল হয়নি দীপঙ্করও জানে। সেজন্যে ভিতরে ভিতরে ও একটু ভয়ও পাচ্ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে চাকরিটা ছেড়ে দিলে ওর নিজের পায়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই। ও তো একটা প্র্যাকটিস গড়ে তোলার চেষ্টা করেনি এতদিন, চেষ্টা কবলেও পারত কিনা সন্দেহ। অনেকেই তো পারে না। সেটাও তো আরেক ধরনের গুণ। রুগীরা আসে কেন, রোগ তারা সাবাতে পারে বলেই তো। ফি ডবল করে দিলেও ভিড় কমে না কেন? এর নামই তো এফিসিয়েন্সি।

এই চাকরিটা ছেড়ে দিতে হলে চট্ করে অন্য কোথাও একটা বেসরকারী ভাল চাকরি পাবে বলেও মনে হয় না। এতকাল ও একজন সাধারণ ডাক্তার ছিল, এখন সেটুকুও নয়। বিশেষ করে ঐ রোগটার সঙ্গে ওর নাম যুক্ত হয়ে গিয়ে অনেকেব কাছেই হয়তো অচ্ছ্যুৎ হয়ে গেছে। 'আপনি তো একজন স্পেশালিস্ট, বলতে গেলে সায়েন্টিস্ট আপনি, আমাদেব তো সাধারণ একজন জি পি দরকার।'

এখনও অনেকখানি পথ যেতে হবে দীপঙ্করকে। আসল পথটাই বাকি।

যাবার সময় বঙ্কিমবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, বি কেয়ারফুল দীপঙ্কর, পেপাবটা তাড়াতাড়ি রেডি করে জার্নালে পাঠিয়ে দাও। বাজা মারা গেলেই বাজার ছেলে কিন্তু রাজা হয় না। অভিষেক হল আসল, দি অথরিটি। তোমার তেমনি অ্যাকসেপ্টেন্স।

একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলা মানে যে যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া, কে জানত।

দুশ্চিন্তায় অনেক রাত পর্যন্ত ওর ঘুম আসেনি; তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে।

অদ্ভুত দুঃস্বপ্ন। স্বপ্নটা ভেঙে যেতে তাই নিশ্চিন্ত বোধ করল।

স্বপ্নে দেখছিল, একজন প্রচণ্ড নামী ডাক্তার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে একটা মুখোশের দোকানে ঢুকল। সরকারী আমলার মুখোশ পরে বেরিয়ে এল। বললে, এসো আমার সঙ্গে। তার পিছনে পিছনে গেল দীপঙ্কর।

লিফট বেয়ে উঠল। তারপর একটা ঘরে মুখোশের লোকটা ঢুকতেই সকলে দাঁড়িয়ে উঠল। সেই ঘরের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আরেকটা ঘব। বিরাট টেবিল। একদিকে গদি আঁটা হেলানো চেয়ার। মুখোশের লোকটা সেখানে গিয়ে বসল।—তুমিও বসো।

দীপঙ্কর তার কথা শুনে বসতে গিয়ে দেখল টেবিলের সামনে শুধু কাঠের টুল পাতা আছে। চেয়ার নেই। তবু ভয়ে ভয়ে বসল।

মুখোশ বললে, তুমি যে পোস্টে আছো, আর আমি যে পোস্টে আছি, এই ডিফারেন্স তোমাদের সব সময়ে মনে থাকে না, সেজন্যেই এ-ব্যবস্থা।

বলেই মুখোশ কলিং বেল্‌টা টিপল। একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল। মুখোশ বললে, ফাইল।

সঙ্গে সঙ্গে বড় অফিসার মেজ অফিসার ছোট অফিসারেরা ফাইল হাতে ঢুকতে শুরু করল। আর তার ওপর মুখোশ সই দিয়ে চলল।

তাদের বিদায় করে মুখোশ বললে, এসব নিয়ে রিসার্চ শুরু করার আগেই তোমার উচিত ছিল আমার কাছে আসা। আমি তোমাকে অ্যাডভাইস দিতে পারতাম।

একটু থেমে মুখোশ আবার বললে, তোমার এই ক্লেম কেউ বিশ্বাস করছে না।

দীপঙ্কর অসহায় ভাবে মৃদু প্রতিবাদ করলে, স্যার, সায়েন্স তো বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। আমার পেপারটা ছাপা হলে দেখবেন....

—আই নো, আই নো। মুখোশ রেগে গিয়ে চুরুট ধরাল। বললে, তুমি বলতে চাও, আমি এখন শুধু এই চেয়ারে বসা মুখোশ, তোমরা তো সে-সব কথাই বলো, হসপিটালে ছিলাম বলেই চেম্বারে ভিড় হত, এখন হয় না। আমি জানি, আমি জানি।

দীপঙ্কর অসহায়ভাবে বললে, না স্যার, সে-সব কথা আমি বলি না।

মুখোশ বেগে গিয়ে বললে, কিন্তু এখন তোমার চোখ বলছে, তুমি একজন ইন্টারন্যাশনালি ফেমাস সায়েন্টিস্ট, আর আমি সামান্য একটা গদি-আঁটা চেযারে বসা মুখোশ। আই নো, আই নো।

দীপঙ্কর ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ কবল, না স্যাব।

—কিন্তু তুমি কি জানো সাতজন গাইনি আমার কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তোমার ও ব্যাপারটা পাগলের প্রলাপ।

দীপঙ্কর বিভ্রান্ত হয়ে তাকাল মুখোশের দিকে। গাইনি ? এ-ব্যাপারের সঙ্গে তাদের তো স্যার কোন সম্পর্ক নেই!

—আছে। অবশ্যই আছে। তুমি বলছ, তুমি একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার কবেছ, অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু ভ্যাকসিনেট ওনলি উইমেন।

দীপঙ্কর অসহায় কণ্ঠে বললে, কিন্তু উইমেন স্যার শুধু গাইনিদের সম্পত্তি নয়।

মুখোশ রেগে গেল।—কিন্তু ঠ্যালা তো তাদেরই সামলাতে হবে, পরে যদি কোন রি-অ্যাকশন হয়।

দীপঙ্কর বলে উঠল, স্যার সে-সব তো অনেক পরের কথা। তাছাড়া দেখবেন সাহেবরা যদি মেনে নেয়, তখন ওরাও মেনে নেবে। মেয়েদের তো বসন্তের টিকে কলেবার ইনজেকশন সবই দেওয়া হয়।

—কিন্তু ওটা একটা ঘৃণ্য রোগ, সব সমাজেই ও রোগটাকে ঘৃণা করে সকলে।

দীপঙ্কর হেসে উঠল।—আপনি স্যার আনসায়েন্টিফিক কথা বলছেন। রোগটার ভাল চিকিৎসা নেই বলেই ঘৃণ্য মনে হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার মত চট্‌ করে সেরে গেলে আর ঘৃণ্য মনে হত না। টিউবারকুলোসিস দেখুন, আগে বলত রাজযক্ষ্মা, কারও পরিবারে হলে কেউ আর সে দিক মাড়াত না।

—বাজে তর্ক করো না।

—কিন্তু স্যার, ভ্যাকসিনটা ঐ রোগ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, প্লেগের মত, পক্সের মত।

—ইউ মে গো।

বলেই কলিং বেল্‌ টেপার সঙ্গে সঙ্গে মুখোশ চিৎকার করে ডাকল, বেয়ারা।

সুইং ডোর ঠেলার শব্দে দীপঙ্কর ফিরে তাকিয়ে দেখল দুজন বলিষ্ঠ চেহারার বলিষ্ঠ গোঁফওয়ালা লোক ওর দুপাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর ঘুমটা ভেঙে গিয়ে দীপঙ্করকে নিশ্চিন্ত এবং আশ্বস্ত করল। নাঃ, স্বপ্ন, সত্যি নয়।

কিন্তু দীপঙ্কর জানে সব স্বপ্নের মধ্যেই একটা সত্যের বীজ থাকে। একটা কোনও দুশ্চিন্তা।

পরের দিনও সেই কথাগুলোই ওকে বারবার ভাবিয়ে তুলছিল। নিশ্চিন্ত হয়ে টাইপরাইটারের সামনে বসতে পারছিল না। অথচ নিবিষ্টমনে বসে পেপারটা তৈরি করে ফেলতে হবে।

ও বেশ বুঝতে পারছিল, না জেনে ও একটা ভিমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়ে দিয়েছে।

—তুমি তো কারো স্বার্থে ঘা দাওনি, তোমার এত চিন্তা কিসের ? সীমা ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিল।

শুনে হো হো করে হেসে উঠল দীপঙ্কর।—চিন্তা ? চিন্তা নয়, বিরক্তি।

এ রাস্তায় যেদিন এসেছি, সেদিনই মেরুদণ্ডটা খাঁটি স্টিল দিয়ে বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু অনবরত পিঁপড়ে কামড়ালে মানুষ মরে না, জানি, তবে তাকে কাজও করতে দেয় না। পায়ের বুড়ো আঙুল টিপে টিপে তুমি কত পিঁপড়ে মারবে ?

একটু থেমে বলেছিল, স্বপ্নে যে মুখোশ-পরা লোকটাকে দেখলাম, সে হাসপাতাল ভাঙিয়ে বড় ডাক্তার হয়েছিল, এখন আমলা। তাকে হয়তো আমি যথেষ্ট খাতির করতে পারিনি। অনেক কিছু ডিটেল্‌স্‌ জানতে চাইছিল, বলিনি। বললেও বুঝত না। সেজন্যেও রাগ হতে পারে। কিন্তু দুজন বিখ্যাত গাইনি নাকি

সীমা বললে, সাতজন।

দীপঙ্কর হেসে ফেলল। না, ওটা স্বপ্নে। আসলে ডিরেক্টর বলছিলেন, দুজন গাইনি নাকি অবিশ্বাস করছে।

সীমা প্রশ্ন করল, তারা কারা ?

এই সময় অমূল্য এসে হাজির হল। দীপঙ্কর হেসে বললে, হেয়ার ইজ দি কালপ্রিট। তোমার জন্যেই আমার এখন সব কাজ পণ্ড হতে চলেছে। পেপার রেডি করার সময় পাচ্ছি না। গাইনিরা কেউ কেউ নাকি অবিশ্বাস করছে।

অমূল্য হেসে বললে, আমি জানি, সব জানি। ডাক্তার চ্যাটার্জি, আর ডাক্তার মৌলিক। ওরা দুজনই বিখ্যাত বলে ওদেরই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু তার পিছনেও অনেকে জোট বাঁধছে।

—কেন ? আমি তো একটা রোগ পৃথিবী থেকে নির্মূল করার রাস্তা পেয়েছি, একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছি।

অমূল্য হাসতে হাসতে বললে, আপনি কিন্তু বলেছেন ভ্যাকসিনে যে গোনোডোট্রোপিন হরমোন ব্যবহার করা হবে তার ফলে এক ধরনের বন্ধ্যা মেয়েদের বন্ধ্যাত্বও দূর হবার সম্ভাবনা। তাহলে গাইনিদের সম্পর্ক নেই বলছেন কেন ?

দীপঙ্কর বললে হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি। অবশ্য ও দিকটা নিয়ে আর স্টাডি করিনি, বঙ্কিমবাবুকে বলছিলাম, উনি যদি করেন। কিন্তু এতে তো গাইনিদেরই লাভ। তাছাড়া, ভেবে দ্যাখো, কোনও ভ্যাকসিনই মানুষ চট্‌ করে নিতে চায়নি, কিন্তু এই দিকটাও যদি প্রমাণ হয় মেয়েরা নিতে রাজি হবে।

দীপঙ্কর বললে. তাছাড়া ওর সঙ্গে তো ভ্যাকসিনের কোন সম্পর্ক নেই। ব্রাউন মাইসের ওপর ওটা প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখলাম····

এই নির্বোধ মানুষটাকে কি বোঝাবে অমূল্য। শুধু বললে, অন্যায়টা আমিই করেছি। কি জানেন সীমাবৌদি, যতই সিনিক হয়ে উঠি না কেন, আমার মধ্যেও কখনো কখনো

আদর্শ-ফাদর্শ উঁকি দেয়। ভাবলাম, সেই তো বিলেত আমেরিকা ঘুরে খবর আসবে, তখন ছাপা হবে, এমন একটা গর্বের খবর, নিজেরাই ছেপে দিই।

সীমা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, না না ভাই, তুমি কোন দোষ করোনি। যা সত্যি, তা ছাপা হবে নাই বা কেন।

দীপঙ্কর হেসে উঠল।—এত ওয়ারিড হবার কিছু নেই অমূল্য। ওরা কাকে খুন করতে পারে, বড়ো জোর আমাকে। সায়েন্স নিডস নো বডিগার্ড, বিজ্ঞানের কোন বডিগার্ড দরকার হয় না। তাকে কেউ খুন করতে পারে না।

অমূল্য হাসল। —ঠিক। কিন্তু দুঃখ কি জানেন দীপঙ্করদা, কিলার্সদের নামগুলো কেউ লিখে রাখে না, আর ইতিহাসে তারা এতই তুচ্ছ হয়ে যায় যে নামগুলো লিখে রাখার কেউ প্রয়োজন বোধ করে না। ওরা টাকা করে, বাড়ি করে, জাঁকিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়, তারপর একসময় ভ্যানিশ হয়ে যায়।

দীপঙ্কর বললে, এটা রাগের কথা। সব ডাক্তার তা নয়, আমরা যাঁদের কথা মনে করে রেখেছি, ভেবে দ্যাখো....

অমূল্য বললে, তাঁরা শুধু ডাক্তারই ছিলেন না। ফার্স্ট অ্যান্ড ফোরমোস্ট তাঁরা প্রথমে মানুষ ছিলেন, তারপর ডাক্তার।

দীপঙ্কর বললে, একালেও তেমন মানুষ আছেন। সার্জেন, গাইনি....

—আঙুলে গোনা যায়। অমূল্য বললে। একটু থেমে বললে, আসলে এরা তো গাড়ির মিস্ত্রি, মোটর মেকানিক। প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে বলেই এত সম্মান, এবং এত টাকা।

দীপঙ্কর হেসে বললে, তুমি সত্যি সিনিক হয়ে যাচ্ছ। এখন যাও, এখন যাও, আমার এখন অনেক কাজ। হসপিটালে যেতে হবে।

অমূল্য আসে কম, কিন্তু এলে সহজে তাড়ানো যায় না। বসে, গল্প করে, চা-খাবার খেয়ে তবেই বিদায় নেবে।

আরও কিছুটা সময় নষ্ট করে অমূল্য চলে গেল।

স্নান খাওয়াদাওয়া সেরে দীপঙ্কর তৈরি হচ্ছিল, সীমা বললে, ট্যাক্সিতে যেও।

দীপঙ্করের গাড়ি নেই। যা মাইনে পায় তাতে গাড়ি কেনা যায় না। কেনা গেলেও মেনটেন করা যায় না। ও তাই মিনিবাসেই যাতায়াত করে।

দীপঙ্কর হেসে বললে, ভয় নেই, প্রেসার বাড়েনি।

ও ঠিক করে রেখেছে প্রথমেই একবার প্রফেসর কুণ্ডুর সঙ্গে ওঁর কলেজে গিয়ে দেখা করবে। হয়তো অভিমান বশে একটা টেলিফোনও করেননি। আসলে ওঁর কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছে এই রিসার্চের ব্যাপারে। এমনকি কয়েকটা ছোট যন্ত্রপাতিও দু-চারদিনের জন্যে ধার দিয়েছিলেন। কলেজের সম্পত্তি, কেউ জানতে পারলে উনি বিপদে পড়তেন, তবু।

দীপঙ্করের উচিত নিজে গিয়ে বলে আসা। ডিটেল্‌স্‌ ওঁকে এর আগেই কিছু কিছু বলেছে।

সেখান থেকে হসপিটালে।

নানা অ্যাসিডের পাঁচমিশেলি কটু গন্ধে ভরা ল্যাবরেটরি ঘরের শেষ প্রান্তে বসেছিলেন প্রফেসর কুণ্ডু।

দীপঙ্করকে ঘরে ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছ ফুট লম্বা চেহারা, মাথায় মসৃণ টাক, চোখের তারায় ঈষৎ পিঙ্গল আভা।

উঠে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে একটা অদৃশ্য টুপি খুলে কুঁজো হয়ে বাও করার ভঙ্গি করলেন।

দীপঙ্কর লজ্জা পেয়ে গেল ; কারণ প্রফেসর কুণ্ডু শুধু বয়সেই ওর চেয়ে অনেক বড় নন,

রীতিমত একজন নামকরা বিজ্ঞানী।

এখানে ওখানে ছাত্রছাত্রীরা ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিল। প্রফেসর কুণ্ডু তাদের ডাকলেন, বয়েজ !

তারপরই হেসে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বয়েজ ইনক্লুডস গার্লস। কাম হিয়ার। এখানে এসো সব।

তারা ভিড় করে এল। আর প্রফেসর কুণ্ডু বেশ নাটকীয় ভাবে বললেন, লেট মি ইনট্রোডিউস মাই ফ্রেন্ড, পারহ্যাপস দি গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট....

দীপঙ্কর লজ্জায় অস্বস্তিতে বললে, স্যার, আমি তাহলে পালাব।

প্রফেসর কুণ্ডু হেসে ফেললেন, না বুঝে ছেলেমেয়েরাও।

প্রফেসর কুণ্ডু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, হি ইজ ডক্টর দীপঙ্কর রয়।

সঙ্গে সঙ্গে অবাক হওয়ার একটা সমবেত ধ্বনি শোনা গেল।

ছেলেরা অনেকে একেবারে ওর গায়ের ওপর এসে পড়ল, দু-একটা প্রশ্ন করল।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে উত্তর দিচ্ছিল, একটি মেয়ে এগিয়ে এসে একটি ছেলেকে বললে, এই সরে দাঁড়া।

তারপর দীপঙ্করকে বললে, দাঁড়ান, আপনাকে একটা প্রণাম করব।

বলে মেয়েটি ওকে প্রণাম করল। দেখাদেখি আরেকটি মেয়েও। প্রথম মেয়েটি ওকে প্রণাম করে প্রফেসব কুণ্ডুকেও প্রণাম করল। আর প্রফেসর কুণ্ডু হেসে উঠে বললেন, মেয়ে খুব হিসেবী দেখছি, এখানেও প্যারিটি বজায় রাখছে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

শুধু দীপঙ্করের একটু অস্বস্তি লাগল। ও কাউকে প্রণামটনাম করে না, অভ্যস্ত নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মনে হল প্রফেসর কুণ্ডুকে ওর প্রণাম করা উচিত ছিল। কিন্তু পারল না।

দীপঙ্কর ভেবেছিল চুপচাপ এসে প্রফেসর কুণ্ডুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবে। এবং কিভাবে ওর গবেষণা সাফল্য লাভ করল তার বর্ণনাও দেবে।

প্রফেসর কুণ্ডু বললেন, শুধু হাতে কেন ? মিষ্টি কই ?

ছাত্রছাত্রীর দল আবার হেসে উঠল।

এরই মধ্যে কেউ হয়তো খবরটা বাইরে পাচার করে দিয়েছে। দেখা গেল করিডরে কেউ কেউ পায়চারি করছে, সুইং ডোর ঠেলে দু-একজন উঁকি দিয়েও গেল।

ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যে কি সব ফিসফাস যুক্তি করে এসে আব্দার ধরল, স্যার, আমাদের কলেজে একদিন একটা লেকচার দিতে হবে।

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, দেব।

আর প্রফেসর কুণ্ডু বললেন, উনি শুধু ডাক্তার নন, হি হ্যাজ এ ডক্টরেট ট্যু ইন হিজ পকেট। ডক্টরেট অফ সায়েন্স।

দীপঙ্কর নিজেও যেন চমকে উঠল। ও যে অনেককাল আগে, প্রথম দিকেই একটা ডক্টরেট পেয়েছিল তা যেন ভুলেই গিয়েছে।

প্রফেসর কুণ্ডুর ব্যবহারে, ওঁর ছাত্রছাত্রীদের বিস্ময় মেশানো শ্রদ্ধায় দীপঙ্কর অভিভূত হয়ে গেল। পৃথিবীর রঙ বদলে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

মনে মনে ভাবল, আমরা প্রত্যেকটি মানুষ এই ভুলই করি। আমরা আমাদের কাছের গণ্ডির মধ্যেই নিজেদের মূল্য যাচাই করি, মূল্য না পেলে ভেঙে পড়ি, হতাশ হই।

দীপঙ্কর যেন একটা বিরাট সান্ত্বনা পেয়ে গেল, বটবৃক্ষের ছায়ার মত।

ছেলেবেলায় স্কুলে একটা পিরিয়ড ছিল ফিজিক্যাল ট্রেনিং। একদল ছেলে হাঁটু গেড়ে

চার-হাত-পায়ে বসত, তার পিঠে আরেক দল, এইভাবে ছোট হতে হতে একটা পিরামিড বানানো হয়ে যেত। হয়ে গেলেই টিচাররা হাততালি দিতেন।

এই আমলাতন্ত্রও ঠিক ঐ রকম হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে সেক্রেটারি থেকে কেরানী অবধি পিরামিড হয়ে আছে বলেই বিশ্বভুবনের কোনও ব্যাপারে হাততালি দেবার ক্ষমতা নেই। আর হাততালিতে অভ্যস্ত নয় বলেই কেবল ক্ষমতার দম্ভ দেখিয়ে হাততালি পেতে চায়।

কিন্তু ওর সহকর্মীরা ? ডাক্তার বন্ধুরা ? তাদের কারও কারও চোখে ও এতকাল যে তাচ্ছিল্য দেখে এসেছে, ও ভাবত তা শুধুই অসাফল্যের প্রতি সাফল্যের উপেক্ষা। ও তো সাকশেসফুল ডাক্তার হয়ে উঠতে পারেনি, সেজন্যেই।

আজ প্রফেসর কুণ্ডুর কথায় কারণটা যেন খুঁজে পেয়েছে। প্রফেসর কুণ্ডুই ওকে মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। হি হ্যাজ এ ডক্টরেট ইন হিজ পকেট।

ডাক্তার হলেও ওর পিঠে যে একটা বিজ্ঞানীর ছাপ আছে সেটাই কেউ কেউ হয়তো পছন্দ করে না। দীপঙ্কর ভুলে থাকলে কি হবে, তারা ভুলতে পারে না।

গতকাল সেক্রেটারির সঙ্গে প্রথমে এবং পরে ডিরেক্টরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে ও যখন ওর হাসপাতালে এসেছিল, অনেকেই হেসেছে, অভিনন্দন জানিয়েছে ; দু-একটা কথা জানতেও চেয়েছে।

প্রফেসর কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা করে খুশি-খুশি মন নিয়ে হাসপাতালে এসে কিন্তু ওর কেমন খট্‌কা লাগল। হঠাৎ বাতাবাতি কোথায় কি একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে।

সকলেই কেমন চুপচাপ, কিংবা এড়িয়ে চলেছে। দু-চারজন কম বয়েসী হাউস সার্জন শুধু কৃতার্থ হওয়ার ভঙ্গিতে কথা বলছিল।

দীপঙ্কর ওর চেয়ারে বসেছিল। দীপঙ্কর লক্ষ করল গলায় স্টেথিসকোপ ঝোলানো একটি ছেলে ঘুরঘুর করছে। কেন বুঝতে পারছিল না।

হঠাৎ একসময় দীপঙ্কর একা হয়ে যেতেই সে এগিয়ে এল।

তারপর বেশ বিনীত বিগলিত হাসি হেসে ফিসফিস করে বললে, ডক্টর রয়, ব্যাপারটা সত্যি তো ?

—কোন ব্যাপারটা ? দীপঙ্কর চমকে উঠে জিগ্যেস করল।

ছেলেটি মুখ কাচুমাচু করে বললে, না, মানে, ওদের কাছে শুনে এত খারাপ লাগছে। তারপর একটু থেমে বললে, আমি কিন্তু বিশ্বাস করেছি।

দীপঙ্কর ভিতরে ভিতরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তবু নিজেকে যতখানি সম্ভব সংযত করল।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, রুগীর সঙ্গে ডাক্তারের সম্পর্কটা বিশ্বাসের, ডাক্তারের সঙ্গে ওষুধ কোম্পানির সম্পর্কটা বিশ্বাসের ! কিন্তু ওষুধ জিনিসটা সায়েন্স, ওটা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে না।

ছেলেটি কি বুঝল কে জানে, বললে, ঠিক বলেছেন।

বলেই চলে গেল।

আর দীপঙ্করের মনে হল ওর অজ্ঞাতে কোথায় কি যেন একটা ঘটে চলেছে। কোন চক্রান্ত ? কিন্তু কেন ?

৪

রামানন্দ সান্যালের মত সুদর্শন সুপুরুষ চেহারা গাইনিদের মধ্যে বিরল বললে কমিয়ে বলা হয়।

অরিজিৎ ব্যানার্জির স্ত্রী পারমিতা একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, ডাক্তার সান্যাল, আপনার

কিন্তু সিনেমায় নামা উচিত ছিল, ভাল হিরোর যা অভাব আজকাল।

রামানন্দ হেসে বলেছিল, ভাল হিরোইনেরও অভাব।

পারমিতা চোখ পাকিয়ে বলেছে, দেখুন মশাই, আমার ছেলে বিলেতে পড়তে গেছে, মেয়ের এবার বিয়ে দেব। আপনাদের চলে, দেখছেন না, পাকা চুল নিয়েও রাজকাপুর দিব্যি হিরো হচ্ছে। উত্তমকুমার ?

অনেকে বলে গাইনি হিসেবে রামানন্দ সান্যালের এই দ্রুত খ্যাতি ও আর্থিক প্রতিপত্তির পিছনে ওর চেহারাটাও কাজে দিয়েছে। প্রায় সিনেমার রোমান্টিক অভিনেতাদের মত একটা সংযত অমায়িক হাসি ওর মুখে লেগেই থাকে। ব্যবহারে কথাবার্তায় এমন একটা আত্মবিশ্বাস, ব্যক্তিত্ব এবং বিনয় পরস্পরের সঙ্গে মিশে থাকে যে বিভ্রান্ত রোগিণী এবং তাব অভিভাবকরা মুগ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া ওর ছাপানো লেটাব হেডে যে-সব দেশী-বিদেশী ডিগ্রি আছে, তা লিখতে রোমান হরফের বোধহয় সবকটা অ্যালফাবেটই প্রয়োজন। ওর সার্জারির হাতও অসম্ভব ভালো, যদিও কখনও কখনও রক্তে ভেজা তোযালে, কিংবা ছুবি কাঁচি ইত্যাদি ভিতরে রেখে সেলাই সম্পন্ন করেছে। তেমন দুর্ঘটনা অবশ্য কদাচিৎ ঘটেছে এবং তার জন্যে রামানন্দর অনুশোচনা হযনি বললে অন্যায় বলা হবে।

আসলে রামানন্দ কিন্তু খুবই দায়িত্বশীল চিকিৎসক। প্রভূত টাকা উপার্জন কবেছে এবং এখনও করে। নিজেরই নার্সিং হোম, বেশ বড-সড়, এবং তার চেয়েও বেশি খ্যাতি। এ লাইনের সকলেই যথেষ্ট সমীহ করে। কনফাবেন্সে যায়, প্রেসিডেন্ট হয, কাগজে ছবি ছাপা হয়।

দীপঙ্কর রায়ের খবরটা রামানন্দ দেখেছিল, তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এ-বকম খবর মাঝেসাঝেই দেখা যায়, সবকারী সূত্রেও হিল্লিদিল্লি নানা রিসার্চ সেন্টারের আবিষ্কাবের দাবি হঠাৎ হঠাৎ খবর হয়ে ছাপা হয, তাবপব সে-সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় না। ভেবেছিল এটাও সে-রকমই কিছু। খবরটা দেখে হেসেছিল। দীপঙ্কব রায়কে মনেও পডল। দু-একবার দেখা হয়েছে। অরিজিৎ ব্যানার্জির গৃহপ্রবেশের দিন এক কোনায় বসে কটি ইযাং ডাক্তারের সঙ্গে খুব জমিয়ে গল্প করছিল, হাসছিল। যাবা আবিষ্কার করে, সিরিযাসলি রিসার্চ করে, তারা অন্য ধাতুতে গড়া। রোনল্ড্ রস কিংবা লুই পাস্তুবের ছবির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ধীর স্থির গম্ভীর প্রকৃতিব মানুষ ওঁরা। সমস্ত জীবনটা কাটিযে দিযেছেন একটা আদর্শের পিছনে। রামানন্দ ভাবল, এই যে আমার সাকশেস, এব পিছনেও একটা আদর্শ কাজ করে গেছে। আজ আমার প্রভূত টাকা, বাড়ি করেছি, নার্সিং হোম কবেছি, কিন্তু কজন জানে যে টাকার প্রতি আমার কোন মোহ নেই। কি অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে আমাকে বড় হতে হয়েছে কজন খবর রাখে। কত দুরূহ অপারেশন কবার জন্যে সাহস কবে এগিয়ে গিয়েছি কে তার হিসেব রাখে।

সকাল বেলাতেই অরিজিৎ ব্যানার্জির টেলিফোনটা পেয়ে হেসে উডিযে দিয়েছিল রামানন্দ। খবরটা ও তখনও শেষ অবধি পড়েও দেখেনি। ব্যাপাবটায় ওব কোন ইনটারেস্ট থাকার কথাও নয়।

ও-সব স্কিন স্পেশালিস্টরা ভাববে, কিংবা ঐ সব হোমের স্পেশালিস্ট ডাক্তাবরা। আমাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক।

কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রেখেই হঠাৎ খটকা লাগল। অবিজিৎ হঠাৎ আমাকে ফোন করল কেন ?

খবরের কাগজটা আবার টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করল। এবং দীপঙ্করের খবরটা শেষ অবধি পড়ে বলে উঠল, আই সি।

জমিটা কিনে এই বাড়িটা করাব সময়ে পাঁচিল দিয়ে ঘিবতে গিযে পাশেব বাড়ির সঙ্গে

একটু ঝগড়া বেধেছিল। ওদের একটা করবী গাছের ডাল এদিকে এসে পড়েছে, ডালটা কেটে না দিলে পাঁচিল ওঠানো যাবে না।

—কেটে দেবেন ? পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বলেছিলেন, পাঁচিলটার হাইট এক ফুট কমই রাখুন না।

কি আব্দার।

—আপনার ডালটাই বড় হল আমার পাঁচিলের চেয়ে ?

লোকটা কি অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়েছিল। বলেছিল, তা নয়, মানে, গাছটা মা বসিয়েছিল। মারা গেছেন অবশ্য, তবে তাঁর আশীর্বাদেই তো বাড়িটা করতে পেরেছি। মায়া হয়।

এনক্রোচমেন্ট জিনিসটা লোককে বোঝানো মুশকিল।

দীপঙ্করের খবরটা পড়েও সেজন্যেই রামানন্দ বিচলিত হয়ে উঠল। দিস ইজ এনক্রোচমেন্ট। তুমি হে ছোকরা ঐ সব অস্পৃশ্য রোগ নিয়ে আছো, কিছু করতে চাও করো। কিন্তু গাইনিদের এলাকায় নাক গলাচ্ছ কেন ?

রামানন্দ বিচলিত বোধ করল, মনে হল একটা কিছু করা দরকার। উপস্থিত ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপার নিয়ে বিব্রত হয়ে আছে বলেই রাগ আরও বেড়ে গেল।

দুপুরে নার্সিং হোমের বেডগুলোয় একটা চক্কর দিয়ে আসে রামানন্দ। সে-সময়ে অন্যান্য জুনিয়াররাও থাকে। দু-একজন নামকরা বন্ধু ডাক্তারও আসে, তাদের পেশেন্টদের দেখে যায়।

একজন নার্স আর একজন জুনিয়র ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বেশ স্মার্ট ভঙ্গিতে ঘরে ঘরে রুগীদের দেখতে দেখতে যাচ্ছিল রামানন্দ।

একটা ঘরে ঢুকে বেডের সামনে এসে দাঁড়াল। হাসতে হাসতে বললে, ব্যস, এবার উঠে পড়ুন, হেঁটে বেড়ান।

ভদ্রমহিলা বালিশে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, দিনকয়েক আগে অপারেশন হয়েছে, জুতোর শব্দে কাগজটা সরিয়ে ডাক্তার সান্যালকে দেখে মুখে স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে দিলেন। ভদ্রমহিলাকে দেখলেই বোঝা যায় বেশ ধনী ঘরের স্বামীসোহাগিনী। যেমন রূপসী, তেমনই সুখী সুখী ভাব। কপালের কাছে কোঁকড়ানো চুল, সুন্দর ভুরু, বাঁ চোখের নীচে ছোট্ট একটা কালো স্পট। তিল বোধহয়।

ভদ্রমহিলাকে দেখে চট করে ধরা না গেলেও বয়েস হয়েছে, চল্লিশ পার করেছেন, ঈষৎ স্থূলত্বের আভাস থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু ধনী গৃহিণী বলেই হয়তো কথায় একটা আদুরে আদুরে ভাব, কিঞ্চিৎ ন্যাকামি এবং অনেকখানি বোকামি মেশানো।

ভদ্রমহিলা ডাক্তার সান্যালকে দেখেই হাসলেন, জিগ্যেস করলেন, ডাক্তারবাবু, আজ কেমন দেখছেন বলুন। ভাল আছি ?

রামানন্দ হেসে ফেলল। বিশেষ করে এই ধরনের কথা নার্স ও জুনিয়ারের সামনে শুনতে হলে হাসি পাবারই কথা। তবু এরাই তো রামানন্দর লক্ষ্মী, অর্থাৎ লক্ষ্মী এনে দেয়।

তাই রামানন্দ হেসে বললে, ফাইন ! এবার একটু একটু দাঁড়াতে, হাঁটতে চেষ্টা করুন ; তা হলেই ছুটি।

ভদ্রমহিলাকে বেশ খুশি দেখাল। আর রামানন্দ নার্সের হাত থেকে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে আরও কিছু ওষুধ লিখে দেবার নির্দেশ দিল জুনিয়ারকে।

ঠিক তখনই ভদ্রমহিলা বলে বসলেন, ডাক্তারবাবু, কাগজে আজ একটা দারুণ খবর আছে দেখেছেন ?

এই রোগিণীর আদুরেপনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে রামানন্দ, সেজন্যেই হাসতে হাসতে বললে, কি খবর ?

—বা রে, দেখেননি ? বলেই কাগজটা টেনে নিয়ে আঙুল দেখাল সেই জায়গাটায়, যেখানে দীপঙ্কর রায় সম্পর্কে খবরটা ছাপা হয়েছে।

রামানন্দর মুখের চেহারা যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। কিন্তু সেটা যাতে নার্স বা জুনিয়ার ধরতে না পারে সেজন্যেই রামানন্দ কেমন একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। বলল, হুঁ।

—দীপঙ্কর রায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে ? দেখেছেন ওঁকে ? এমন বিস্ময় মেশানো আদুরে গলায় কথাটা বললেন ভদ্রমহিলা যে রামানন্দর মনে হল চিনি না বললে রামানন্দর নিজেরই মূল্য কমে যাবে ওঁর কাছে।

রামানন্দ হেসে বললে, আছে।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে বেশ আদুরে আদুরে কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন করে বসলেন, ডাক্তারবাবু আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন ?

ওঁর এই বোকামি দেখে নার্স এবং জুনিয়ার একসঙ্গে হেসে উঠল।

আর রামানন্দর সেই হাসিটাও কেমন অসহ্য লাগল।

অস্বস্তি কাটাবার জন্যে রামানন্দকে ব্যস্ততা দেখাতে হল।

বললে, চলি।

বাইরে বেরিয়ে এসে নার্স আর জুনিয়ারকে উদ্দেশ করে বললে, কত রকম স্টুপিড পেশেন্টদের যে টলারেট করতে হয় !

ওরা নিঃশব্দে শুধু হাসল।

রামানন্দ মনে মনে ভাবল, এই সব মূর্খ সাধারণ মানুষরাই আমাদের বুকের মধ্যে ঈর্ষা জ্বালিয়ে দেয়। দীপঙ্কর রায়ের ওপর ওব তো কোন বাগ নেই, ঈর্ষাও ছিল না। ঈর্ষা কবার মত তাব আছেই বা কি। এতদিনে নামের পাশে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসব লিখতে পাচ্ছে। রামানন্দ কতকাল আগে ওসব পাট চুকিয়ে এসেছে। প্রফেসরও হয়েছিল। একটা পুরো গাইনি ডিপার্টমেন্ট ছিল ওব হাতে। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে না, কি সব আইনকানুন করতে গেল, চাকরিতেই ইস্তফা দিয়ে দিল রামানন্দ। এর নাম যোগ্যতা।

দীপঙ্করকে ঈর্ষা করবে কেন ? না টাকা করতে পেরেছে, না চাকরিতে উন্নতি। চাকরিতে কি করে উন্নতি করতে হয় সেটুকুও জানে না।

ও যদি সত্যি কিছু একটা আবিষ্কার করে বসে থাকে, রামানন্দর ক্ষতি নেই। কিন্তু ওর কথাবার্তা শুনেই বোঝা যাচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা পাগলের প্রলাপ। একটা রোগের ভ্যাকসিন, তার সঙ্গে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ আসে কোত্থেকে ?

—কেন স্যার, চিকেন পক্সের সঙ্গে যদি সম্পর্ক থাকতে পারে, একটা পেপার পড়েছিলাম যেন, চিকেন পক্স যদি পিউবার্টি অ্যাটেন্ড করার পর কোন মেয়ের হয়, অনেক সময়···

রামানন্দ হেসে উঠল। আরে সে অন্য ব্যাপার। একটা রোগ হলে শরীরের কোথাও কোথাও ক্ষতি তো করতেই পারে। যেমন অন্ধ হয়ে যায়।

রামানন্দ নার্সিং হোমে যে ঘরটিতে বসে সে-ঘরে তখন জনাকয়েক গণ্যমান্য চিকিৎসক, বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী।

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন, আমি কিন্তু বিশ্বাস করেছি।

রামানন্দ হেসে উঠল, আপনার নামেই তো বিশ্বাস।

রামানন্দ বন্ধু হলেও তার এই ধরনের খেলো কথায় ডাক্তার বিশ্বাস একটু আহত হলেন। বিশেষ করে ইয়াং ছেলেগুলো হেসে উঠল বলে।

উনি চুপ করে গেলেন।

রামানন্দ বললে, দীপঙ্করের ওটা একটা স্টান্ট, প্রোমোশন পাওয়ার রাস্তা তৈরি করছে।

কিংবা পি জি-তে ট্র্যান্সফার চাইছে।

আরেকজন বলে উঠল, ঠিক ধরেছেন। হেলথ ডিপার্টমেন্ট আবার এই সব আবিষ্কার-টাবিষ্কার শুনলে ঘাবড়ে যায়, সমীহ করে।

ডাক্তার বিশ্বাস ছাড়া আর সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

রামানন্দর ভক্ত শিষ্য এক বাচ্চা ডাক্তার, রুজিরোজগারের জন্যে যাকে রামানন্দর ওপরই নির্ভর করতে হয়, সে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, স্যার, এর নাম তো প্রতারণা।

ডাক্তার বিশ্বাসও একজন সুবিখ্যাত গাইনি। দক্ষ সার্জেন হিসেবেও প্রচুব নাম। তবে খুব গরিবের ঘর থেকে বড় হযেছেন। টাকা করেছেন, বাড়ি গাড়ি সবই। তবে বামানন্দর মত এতখানি নয়। চরিত্রে রামানন্দর মত এতটা আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন দম্ভও নেই।

ডাক্তার বিশ্বাস অর্থলোলুপ নন, ফি বাডিয়েছেন, কিন্তু যৎসামান্য। দিনকাল যা পড়েছে না বাড়িয়ে উপায় নেই।

কিন্তু টাকার নেশায় পড়ে যাননি। দরিদ্র-দুঃস্থ লোকের কাছ থেকে কখনও কখনও কম ফি নেন। ওঁর মধ্যে কেমন একটা তৃপ্ত ভাব আছে, এবং মানুষেব প্রতি বিশ্বাস।

খবরটা পড়ে ডাক্তার বিশ্বাসের ভীষণ ভাল লেগেছিল। যাক্ গর্ব কবার মত বাঙালীর ভাগ্যে আবার কিছু জুটল। যদি সত্যি হয়, হবে নাই বা কেন, সায়েন্সের ইতিহাসে আরেকটা বাঙালী নাম। বাঙালী বলছি কেন, ইন্ডিয়ান।

বাচ্চা ডাক্তারটি নিঃসন্দেহে বামানন্দকে খুশি করার জন্যে বলে উঠল, এব নাম প্রতারণা।

ডাক্তার বিশ্বাস অবাক হয়ে তাকালেন তাব দিকে। অন্য সকলেব দিকে। মনে হল সকলেই রামানন্দর দিকে। হবারই কথা। কারণ এই নার্সিং হোম রামানন্দর। ওরা সকলেই এটার ওপর নির্ভর করে আছে। ওরা দল হয়ে গেছে। কে দল বানায়? স্বার্থ, আবাব কে!

ডাক্তার বিশ্বাস জানেন রামানন্দ অখুশি হলেও ওঁর কিছু যায় আসে না। ওঁব পেশেন্টবা ওঁর কাছেই আসে। আসবেও।

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন, শুনলাম আজ বি বি সি থেকেও খবরটা বলেছে। ওদের দেশ থেকে কেউ স্বীকৃতি না দিলে আমাদের অবিশ্বাস যাবে না।

হেসে বললেন, আমরা তো বিচারক নই, বিচার করার লোক অন্য। তারা সায়েন্টিস্ট। তারা কি বলে দেখাই যাক না।

—তাহলে আপনি বিশ্বাস করেছেন এ-কথা বললেন কেন? একজন বলে উঠল।

ডাক্তার বিশ্বাস হাসলেন। বললেন, একটাই কারণ। আমি দীপঙ্কর রায়কে চিনি না, কখনও দেখিনি। কিন্তু শুনলাম রিসার্চের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন দীর্ঘকাল। সায়েন্সে ডক্টরেটও করেছিলেন। তাছাড়া একজন অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর মেডিকেলেও।

সকলে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। —অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসব তো কতই আছে।

ডাক্তার বিশ্বাস ওদের হাসি শুনেও বিব্রত বোধ করলেন না।

বললেন, ডাক্তার দীপঙ্কর রায় যা হয়েছেন, তাও প্রতিষ্ঠা হিসেবে ফেলনা নয়। একটা লোক জালিয়াতি করে সে-সব বিসর্জন দিতে যাবে কেন? সে তো জানে শেষ পর্যন্ত বিদেশেব সায়েন্টিস্টরা স্বীকৃতি না দিলে কিছুই নয়। উপরন্তু এখানে দুর্নাম।

রামানন্দ ভিতরে ভিতরে ক্রমশই রেগে যাচ্ছিল।

ডাক্তার বিশ্বাসের কথাগুলো শুনে ওর মনে হল, দু-একজন ওর কথাতেও কনভিন্সড হয়ে যেতে পারে। অথচ, এতক্ষণ ওরা রামানন্দর কথাই বিশ্বাস করছিল।

রামানন্দ বললে, বিলেত পর্যন্ত যাতে ব্যাপারটা না গড়ায় সেটা আমাদেরই দেখা উচিত। আমাদের দুর্নাম।

সেই ভক্ত শিষ্যটি বললে, আমাদের ইন্ডিয়ান ডাক্তারদের এমনিতেই বিলেতে আজকাল সেই আদর নেই। এরপর এই সব ফোজারি ঘটলে.....

রাইট ইউ আর। রামানন্দ বললে। তাছাড়া দীপঙ্করকে আমি চিনি, দেখেছি। একেবারে হাল্কা টাইপের, কোন সিরিয়াসনেস তার মধ্যে দেখিনি। হাসি ইয়ার্কি ফাজলামিই জানে শুধু।

ডাক্তার বিশ্বাস বললেন, আপনি আইনস্টাইনকে শুধু বেহালা বাজাতে দেখে থাকলেও তো এ-কথাই বলতেন।

ডাক্তার বিশ্বাস হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন।—উঠি। আমাদের তো আবার টাকা রোজগারের ধান্দা, এসব নিয়ে সময় নষ্ট করার মত সময় নেই।

চলে গেলেন।

আর কে যেন বলে উঠল, দাম্ভিক। এই দম্ভ নিয়েই গেলেন।

একজন ওঁর গায়ের রঙ নিয়ে, কিংবা ঐ ধরনের কি একটা নোংবা ব্যাপার নিয়ে মন্তব্য করল।

কিন্তু রামানন্দ কোন কথা বলল না।

আসলে ডাক্তার বিশ্বাসেরও তো একটা প্রতিষ্ঠা আছে, খ্যাতি আছে। এমন দু-একজন যদি দীপঙ্করের দিকে চলে যায়, রামানন্দর ভয়.স্রেফ এই ব্লাফটাই অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যাবে।

এটা শুধু একটা ভ্যাকসিনের ব্যাপার নয়। সায়েন্সের ব্যাপার নয়।

এটা একটা স্থায়ী অটল অনড় পিরামিড ধসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। এসটাবলিশমেন্ট ধসিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা।

আমরা সকলেই এর মধ্যে জড়িয়ে আছি।

সেই ভক্ত শিষ্যটি বলে উঠল, বন্ধ্যাত্ব দূর হয়ে যাবে। হেসে উঠল সে ; বললে, তাহলে আমাদের কি নিয়ে চলবে ?

ওটা নির্বোধ। কে যেন বলেছেন না, নির্বোধ ভক্তের চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রু ভাল। রামানন্দ ওসব দিক নিয়ে ভাবছে না। রাতারাতি সব পেশেন্ট কি দীপঙ্করের কাছে চলে যাবে নাকি ! তা নয়। প্র্যাকটিস পড়ে যাবে না। সে ভয় ও পায় না।

এটা সম্মানের প্রশ্ন। আসনের প্রশ্ন। দি চেয়ার।

আমরা সকলে মিলে একটা পিরামিড গড়ে তুলেছি। সেই ইস্কুলে ড্রিল মাস্টারের নির্দেশে বানানো পিরামিড। ড্রিল বলে না, আজকাল পি টি ক্লাস। একদলের পিঠে বা কাঁধে আরেকদল তারপর পিঠে আরেকদল। ক্রমশই ছোট হয়ে হয়ে রামানন্দ এখন টপে। সকলে অবশ্য স্বীকার করে না, না করুক। সান্ত্বনা এই, কেউই টপে নেই। আমরা কজনই প্রধান।

এই পিরামিড থাকলে আমাদের সকলের পজিশন আছে, সম্মান আছে। দীপঙ্কর রায় যদি একটু একটু করে এই পিরামিডের ওপরের আসনে উঠে আসত, কারও কোনও আপত্তি ছিল না। বরং রামানন্দ তাকে সাহায্যই করত। এমনকি ডিরেক্টরকে ইনফ্লুয়েন্স করে ওকে প্রফেসর বানিয়ে দিতেও পারত। একটাই শর্ত, পিরামিডটা যেন থাকে।

দীপঙ্কর সে-পথে না গিয়ে হঠাৎ যেন একেবারে নীচের ধাপের একজনকে ল্যাং মেরে ফেলে দিতে চাইছে। একজন পড়লেই সমস্ত পিরামিডটাই হুড়মুড় করে ধসে পড়বে।

কে বড় কে ছোট, কার কত ফি, আমরা বেশ একটা গোছানো সংসার করে নিয়েছি। সেটাকেই ভেঙে চুরমার করতে চায় দীপঙ্কর।

আমরা তো জানতাম ডাক্তারিতে বড় হলেই সে বড় ডাক্তার। সকলে তা স্বীকার করত। হঠাৎ এর মধ্যে একজন আবিষ্কারক সাজতে চাইছে।

ধনী ঘরের ঐ পেশেন্ট ভদ্রমহিলা যখন জিগ্যেস করে বসলেন, আপনি কিছু আবিষ্কার করেছেন, তখন রামানন্দর নিজেকে বড়ো তুচ্ছ মনে হয়েছিল। এত প্রতিষ্ঠা, অর্থসম্পদ, খ্যাতি যেন মুহূর্তে মূল্যহীন করে দিয়েছে ঐ দীপঙ্কর। ভদ্রমহিলার চোখে তার প্রতি বিস্ময় এবং অভিভূত ভাব লক্ষ করেছে রামানন্দ। শ্রদ্ধা। পিরামিড বেয়ে ধাপে ধাপে না উঠেও দীপঙ্কর একেবারে টপে উঠে গেছে। অথচ এই রিসার্চ করা লোকগুলোকে এতকাল তো করুণার চোখে দেখে এসেছে।

রামানন্দ ধীরে ধীরে বললে, উই মাস্ট ডু সামথিং। বি বি সি-তে নিউজ করেছে, শেষে কি কেলেঙ্কারিই না হবে।

হাসতে হাসতে বললে, রিসার্চ আমরাও করেছি। কিন্তু এ-রকম হৈ চৈ বাধাইনি কখনও। উদ্ভট কিছু ক্লেম করে বসিনি।

কথাটা মিথ্যে নয়। রামানন্দ একাই নয়, বহু বড বড় ডাক্তারই তো এম ডি করেছেন, মেডিকেল জার্নালে দু-একটা পেপারও ছাপা হয়েছে। তবে ?

বি বি সি-তে নিউজ করেছে। শেষে কি কেলেঙ্কারিই না হবে।

সকলেই একবাক্যে রামানন্দর কথায় সায় দিল। হ্যাঁ, একটা কিছু করতেই হবে। উই মাস্ট ডু সামথিং।

কিন্তু কি করবে, কেউই খুঁজে পেল না। উপস্থিত একটাই কাজ করা যায়। সমস্ত ব্যাপারটাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া।

রামানন্দ দুটো কাঁধ কাঁপিয়ে শ্রাগ করল। তোমরাই যা হোক কিছু একটা করো। একটা জালিয়াতিকে নির্বিবাদে চলতে দেওয়া উচিত নয়।

কে একজন বললে, কিন্তু ডাক্তার বিশ্বাসের মত কেউ কেউ হয়ত ওঁর হয়ে ওকালতি করবেন।

রামানন্দ হাসল।—বেস্ট অ্যাসিওর্ড, কেউ কিচ্ছু করবে না। এই ধরনের লোকগুলো খুব নির্বিরোধী হয়।

বলেই উঠে পড়ল। কিছু একটা করতে হবেই। সযত্নে বানিয়ে তোলা পিরামিডটা এভাবে ভাঙতে দেওয়া যাবে না। ঐ পিরামিড বেয়েই তো ও ওপরে উঠেছে। ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

সবচেয়ে ভাল হয় ঐ লাইনেরই একজন স্পেশালিস্ট কাউকে সঙ্গে পেলে। কাকে পাওয়া যাবে ?

নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরে ফোন নম্বরটা দেখে নিয়ে রামানন্দ ডায়াল করল অরিজিৎকে। অরিজিৎ ব্যানার্জি।

—দ্যাখো অরিজিৎ, ভেবেছিলাম চুপচাপ থাকব। লেট ইট টেক ইটস ওন কোর্স। ব্লাফ শেষ অবধি ধরা পড়বেই। লোকটা, মানে তোমার ঐ দীপঙ্কর, শেষে মুখ দেখাতে পারবে না। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আমরাও তো মুখ দেখাতে পারব না। আফটার অল, ও যদি ডাক্তার না হত আমাদের কিছু যায় আসত না।

অরিজিৎ বললে, রাইট ইউ আর। আমাদের লজ্জা। আরে পারমিতাকে সে-কথাই তো বোঝাতে পারছি না। মেয়েদের মাথায়, বুঝলে কিনা, কিস্যু নেই। ও আবার রাত্তিরে ওকে খাবার নেমন্তন্ন করে বসতে চাইছে। আমার পক্ষে ওপেনলি কিছু বলা মুশকিল। গৃহবিবাদ হয়ে যাবে।

অরিজিৎ হাসল।

রামানন্দ বললে, কিন্তু কর্তব্য বলে একটা কথা আছে। আমাদের প্রফেশনকে আমরা মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি না।

অরিজিৎ বললে, ঠিকই তো। আর শোনো, ডিরেক্টর ফোন করেছিলেন। বললেন, ডেকে পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন দীপঙ্করকে। হোয়াট অড্যাসিটি, বলেছে কিনা আই হ্যাভ নাথিং টু অ্যাড। খুব চটে আছেন ডিরেক্টর। একসেপশন নিয়েছেন। আমরা সাপোর্ট করছি কিনা জানতে চাইলেন।

—সাপোর্ট ?

রামানন্দ শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, নিশ্চিন্ত থাকো, আমি ফেউ লাগিয়ে দিচ্ছি। ওঁকে মেজাজ দেখাতে পারে, বাট হি শ্যাল হ্যাভ টু ফেস অল অফ আস। হি শুড এক্সপ্লেন। আমরা রিপোর্টার নই যে যা বলল বিশ্বাস কবে নিলাম।

অরিজিৎ বললে, ফাইন। তোমরা ওকে মিট করতে বলো। আব হ্যাঁ, ডিবেক্টবের সঙ্গে একবার কথা বলে নাও।

ফোন ছেড়ে দিল অরিজিৎ। তাড়াহুড়ো কবে বললে, এখন রাখছি, এখন বাখছি। পরে কথা হবে।

বামানন্দ স্পষ্ট বুঝতে পারল অরিজিতের স্ত্রী কাছে এসে গেছে। তাই কথা বলতে চাইল না। অরিজিতের এই ব্যাপারটা ওর ভাল লাগে না। ওর স্ত্রী বডলোকেব মেয়ে, তাছাড়া অরিজিৎ শ্বশুরের টাকায় বিলেত গিয়েছিল বলে কেনা গোলাম হয়ে গেছে। স্ত্রীকে কনভিন্স করতে পারে না। আবার নেমন্তন্ন করে খাওযাচ্ছে।

এদিক থেকে রামানন্দর কোন ঝামেলা নেই। ও যা বলে স্ত্রী সেটাই বিশ্বাস করে।

সেজন্যেই বেশ নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু ঐ নার্সিং হোমের পেশেন্ট ভদ্রমহিলা জ্বালা ধবিযে দিয়েছে। বোকা বোকা আদুরে গলায নার্স আর জুনিযাবেব সামনে বললে, আপনি কিছু আবিষ্কাব করেছেন ?

তার ওপর ঐ ডাক্তার বিশ্বাস।

খাবার টেবিলে তিনটে পিঁপড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা তাদের গাযে একে একে ছুঁইয়ে দিতেই জড়িয়ে গিয়ে জড়পদার্থ হয়ে গেল। এবার সিগারেটটা অ্যাশ-ট্রেতে টিপে নিবিয়ে দিল রামানন্দ।

৫

আমন্ত্রণ পেয়ে রীতিমত খুশি হয়েছিল দীপঙ্কর।

ওদের বয়েস অল্প। আগ্রহ এবং কৌতূহল হযতো সেজন্যেই বেশি। এর মধ্যে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা আছে বলে ওর মনে হযনি। প্রফেসর কুণ্ডুর ছাত্রছাত্রীরাও তো বলেছিল, স্যার, আমাদের কলেজে আপনাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। আসলে সকলে শুনতে চায়, জানতে চায়। কম বযেসী ডাক্তারদেব মধ্যে সে-কারণেই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

ওরা পাঁচ-ছজন ইয়াং ডাক্তার এক জোট হয়ে এসেছিল। অমাযিক ব্যবহার কথাবার্তা ওদের। একজন তো হাউস সার্জেন দীপঙ্করের হাসপাতালেই। ছেলেগুলিব চোখেমুখেও বেশ উচ্ছ্বাস লক্ষ করেছে। দুজন বিখ্যাত চিকিৎসকের চিঠি নিয়ে এসেছিল।

বিখ্যাত আধা-বিখ্যাতদের মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে একটু রেষারেষি আছে, দীপঙ্কর জানে। একজনের খ্যাতি বাড়লে আরেকজন কখনও কখনও সহ্য কবতে পারে না, সপার্ষদ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে টীকাটিপ্পনীও দেয়। কেউ আড়ালে, কেউ প্রকাশ্যে। ঠোঁটকাটা কেউ কেউ রুগীর সামনেই ভুল ধবে দেয়। এথিকস মানে না। এ-সব বহুদিন ধরে দেখে আসছে দীপঙ্কর। দেখে হেসেছে নিজের মনে মনেই। ওব সঙ্গে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের কোনও সম্পর্ক নেই বলেই এ-সব নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি।

ছেলেগুলি এসে অনুরোধ করতেই রাজি হয়ে গেল। একটা কনফারেন্স মত হবে, সেখানে দীপঙ্কর তার গবেষণার কথা একটু বিশদ করে বলবে। ওদের চোখে একটা সমীহ ভাবও দেখেছে। রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু যেদিন বক্তৃতা দেবার কথা, সেদিনই সকালের খবরের কাগজে দেখল, কয়েকজন গাইনি তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। দীপঙ্করের গবেষণার সমস্ত ব্যাপারটা নাকি হোক্স। ওটা নাকি সম্ভবই নয়। হিউম্যান ফ্যাক্টরের ওপর রিসার্চ না চালিয়ে এ-রকম একটা ক্লেম করা নাকি হাস্যকর। এবং আনএথিক্যাল।

দীপঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ওসব লেকচার-টেকচারে যাব না।

সীমা ওর মুখোমুখি বসে ছিল, চা খাচ্ছিল। হেসে বললে, তা হয় না। যারা এসেছিল তাদের কি দোষ!

দীপঙ্কর হঠাৎ হঠাৎ চটে যায়। ওটা ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কেউ ওকে বিশ্বাস না করলে, ওর কথার মূল্য না দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

কেউ বোঝালে পরক্ষণেই শান্ত হয়ে যায়।

সীমা টোস্টে মাখন লাগিয়ে প্লেট এগিয়ে দিয়ে বললে, যখন ওদের সামনে রাজি হয়েছ, যেতে তোমাকে হবেই। তা না হলে যা-খুশি বটাতে শুরু করবে।

দীপঙ্কর হেসে ফেলল। বললে, যাব। তুমি যখন বলছ। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, এর সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক। আসলে এটা ডাক্তারদের ব্যাপারই নয়। এটা অ্যাকসেপটেড হবে কি হবে না, বিচার করবে এ লাইনের সায়েন্টিস্টরা। হিউম্যান ফ্যাক্টরের ওপর এক্সপেরিমেন্ট হবে, তার রেজাল্ট রি-অ্যাকশন দেখা হবে, তবেই ওদের বক্তব্য শোনা যাবে। এখনই ওরা এত অধৈর্য হচ্ছে কেন?

সীমা হাসতে হাসতে বললে, বড় হতে গেলে এ-সব সহ্য করতে হয়।

দীপঙ্কর চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে কি যেন ভাবল।

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ওরা জানেই না আবিষ্কারটা আজ হয়নি, দু বছর আগেই পেয়েছি। শুধু টক্সিসিটি দূর করতে একটা বছর কেটে গেছে।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, শুধু একটা জিনিস গোপন করে যেতে হবে এটাই দুঃখ। রেগে গিয়ে যদি বলে ফেলি সমূহ সর্বনাশ, কি বলো?

সীমা শান্ত গলায় বললে, তোমার একার নয়, সেটাও মনে রেখো। বেচারা স্বামীনাথন ...

দীপঙ্কর বললে, আমি জানি এরা সবাই মিলে ওখানেই বাধা দেবে। স্বপ্নে দেখা সেই মুখোশ পরা লোকটা এইখানেই পেয়ে বসবে।

কেমন হতাশ গলায় বললে, তাহলে বাইরে চলে যাব। লন্ডনে, আমেরিকায় যেখানে হোক। কিংবা আফ্রিকায় কোথাও।

একটু থেমে বললে, এই দুটো দেশেই তো আসল প্রবলেম। আফ্রিকা আর ইন্ডিয়া। না, চীন আর সাউথ আমেরিকাতেও।

সীমা দু পা চেয়ারের ওপর তুলে আয়েসে পিঠ এলিয়ে টোস্ট খেতে খেতে বললে, এ কথা বলো না। দেশটা কি তাহলে চিরকালই এ-রকম থাকবে? শুধু টাকা করার কমপিটিশন আর নিচু মনের মানুষ নিয়ে, কাজ করতে হলেই বাইরে পালাতে হবে?

দীপঙ্কর বললে, আমি দেশ-টেশ বুঝি না, আমি মানুষ বুঝি। যে কোন ওষুধ, এই ভ্যাকসিনই ধরো, এ তো সমস্ত মানুষের জন্যেই। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একটা সাংঘাতিক রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবে, চিরকালের জন্যে।

—কিন্তু সেটা যদি এখানেই করে দেখিয়ে দাও, সমস্ত দেশ আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।

আরও অনেকে হয়তো প্রেরণা পাবে।

এই সব কথা সীমা মাঝে মাঝেই বলেছে, যখনই দীপঙ্কব পদে পদে বাধা পেযে অসহায বোধ করেছে।

সীমার কথা শুনে দীপঙ্কর অসহায়ভাবে বলে উঠল, আমি তো এক্সপেবিমেন্ট করে দেখেছি, স্বামীনাথনের ঐ ম্যাড্রাস হোমে। অথচ কাউকে বলতে পারব না। কাবণ সমস্ত ব্যাপারটা বে-আইনি। যেন ঐ মুখোশ-পরা লোকটা একটা ছাপ মেরে দিলেই সব গঙ্গাজলে শুদ্ধ হয়ে যেত। এখন অফিসিয়ালি প্রমাণ দেখানোর জন্যে তাব কাছেই ধর্না দিতে হবে। স্যার, মানুষের ওপর অ্যাপ্লাই কবাব জন্যে পাবমিশন দিন।

শেষ অবধি দীপঙ্কর ঠিক করল ও যাবে।

গেল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে মিটারের টাকা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন এগিযে এল। বেশ খাতির করে ওকে নিয়ে গেল হলের মধ্যে।

সমস্ত চেয়ার ভর্তি হয়েও কিছু ভিড উপচে পডেছে।

"ফ্রেন্ডস.

হাজাব হাজাব বছর ধরে যে রোগ পৃথিবীব সর্বত্র, বিশেষ কবে আফ্রিকায় এবং ইন্ডিযায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট দিযেছে, শুধু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিটিকেই নয়, তার পবিবারবর্গকেও অস্পৃশ্য করে দিযেছে, সমাজ থেকে, মানুষের সাহচর্য থেকে দূবে সরিযে দিযেছে, আমি সেই লেপ্রসির একটা ভ্যাকসিন বেব কবেছি। পনেবো বছরের চেষ্টায়।"

হঠাৎ হল ফাটিয়ে হাততালির শব্দ শোনা গেল।

দীপঙ্করের মনে হল জয় ওর হাতের মুঠোয। ও অকারণ সন্দেহ কবেছে, ও অকারণ ভয পেযেছে।

"আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। তাব প্রয়োজনও নেই, কাবণ আমি আশা করছি এখানে সকলেই চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী। কুষ্ঠবোগ নামটিই আমাদেব দেশে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এ বোগে আক্রান্ত হয়। অথচ ছোঁযাচে রোগ বলতে আমরা যা বুঝি এটি ঠিক সে-রকম ছোঁয়াচে নয, তা আপনারা জানেন। সুতবাং আমাব গবেষণার প্রথম ধাপই ছিল জীবজন্তুব দেহে এই রোগটি সৃষ্টি করা। অনিবার্যভাবে রোগটি সৃষ্টি করতে পাবলে অনিবার্যভাবে তা বোধ কবা যাচ্ছে কিনা তা প্রমাণ কবা সম্ভব।"

ঠিক এই সমযেই শ্রোতাদেব ভিতব থেকে একজন উঠে দাঁডিয়ে বললে. আমরা ভ্যাকসিনের গল্পটা শুনতে চাই।

বাধা পেয়ে দীপঙ্কব থেমে পডেছিল। লোকটিব দিকে একবাব তাকিযে নিযে ও বললে, দীর্ঘকাল ধরে বারংবার কনট্যাক্ট-এ না এলে এ রোগে কেউ আক্রান্ত হয না। অথচ ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগীব সংখ্যাটাব দিকে তাকালে অবাক হতে হয়।

একটু থেমে বললে, আপনাবা জানেন শিশুদেব , বিশেষ কবে কম বয়েসেই এটি আক্রমণ করে, যদিও ইনকিউবেশন পিরিয়ড বেশ দীর্ঘ।

দীপঙ্কর লক্ষ করছিল শ্রোতাদের মাঝখানে কযেকজন কি যেন বলাবলি কবছে। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ইস্কুলেব এসে শুনতে আসিনি আমবা।

দীপঙ্করের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। ও বুঝতে পারল কোথাও কোনও একটা ষডযন্ত্র আছে, ওকে অপদস্থ করার।

দীপঙ্কর তবু শান্ত থাকার চেষ্টা কবে বললে, আমি লেপ্রোমেটাসের কথা বলছি। লেপ্রাব্যাসিলাস কালচার করে যে ভ্যাকসিনটা আমি প্রথমে ইঁদুবের ওপব আই মিন ব্রাউন

মাইসের ওপর পরীক্ষা করি·····

হঠাৎ একটা হট্টগোল শোনা গেল এক প্রান্ত থেকে।

দীপঙ্কর তা উপেক্ষা করে বললে, এই রোগ যে-হেতু ইনফেকশনের বহু পরে, দু-তিন বছর, কখনো কখনো দশ-পনেরো বছর পরেও দেখা দেয় এবং শৈশবেই ইনফেকশন হতে পারে, সেজন্যে আমি দুভাবে পরীক্ষা চালাই। এক ডজন পুরুষ ইঁদুরের ওপর, এক ডজন স্ত্রী ইঁদুরের ওপর। নানাভাবে পরীক্ষা কবে, যাব বিপোর্ট আমি একটি জার্নালে আগেই কিছুটা প্রকাশ করেছি, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মেল এবং ফিমেল দু-দলকেই ভ্যাকসিনেট করার পর মাইকোব্যাকটিরিয়াস লেপ্রিব্যাসিলাস দিয়ে ইনওকুলেট কবলেও তারা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু ভ্যাকসিনেট করা ফিমেল ইঁদুরের সন্তান-সন্ততির সে-বোগ হচ্ছে না। বারংবার ইনফেক্ট করলেও হচ্ছে না। আমি ঐ ব্যাসিলাসকে ফ্রিজ ড্রাইং প্রসেসে·····

একজন উঠে দাঁড়িযে বললে, এই লোড শেডিং-এ ফ্রিজ কবলেন? কোন্ বেফ্রিজারেটরে বলবেন?

দীপঙ্কব চিৎকাব করে বললে, এখানে কি একজনও সাযেন্টিস্ট নেই? তিনি এর উত্তব দিয়ে দিন। বুঝিযে দিন যে ফ্রিজ মানেই আপনাব বাড়ির ফ্রিজ নয।

একটি চ্যাংড়া টাইপের ছেলে এই সময়ে বসে বসেই হল কাঁপিযে চিৎকার কবে উঠল, লেপার ডাক্তারকে বসে পডতে বল।

আর সামনের দিকের চেযার থেকে উঠে দাঁড়িযে একজন খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে বললে, ডক্টব রয, উই আব নট ইন্টারেস্টেড ইন লেপ্রসি।

দীপঙ্কর বিভ্রান্তভাবে বললে, কিন্তু আমি তো লেপ্রসিব ভ্যাকসিনই আবিষ্কার করেছি। অবকোর্স শুধু লেপ্রোমেটাস। এক্সোন ও হরমোন দিয়ে হোস্ট পাওযার পর···

আরেকজন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁডিয়ে বললে, আপনি কি আশা করেন লেপ্রসিব মত একটা ঘৃণ্য রোগ মেয়েদেব শরীবে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, শুধু কিছু লোকেব এই বোগ হয় বলেই?

দীপঙ্কব রেগে গেল। বললে, সাম পিপল নয, সাম মিলিযনস অফ পিপল। তাছাডা আমাদের দেশে কয়েকটা লেপার জোন আছে, কই পক্সেব ভ্যাকসিনে তো আপত্তি কবেন না। সেও তো সুস্থ শবীবে বীজাণু ঢুকিয়ে দেওযা।

আরেকজন উঠে দাঁডাল। বললে, গাইনোকোলজিক্যাল সাইড থেকে একটা প্রশ্ন বাখছি। আপনি বলেছেন ক্রোমোসোমেব বদলে ঐ ভ্যাকসিন দিযেই নাকি বন্ধ্যা নারীর গর্ভোৎপাদন ঘটানো যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক অট্টহাসে হেসে উঠল। আর বাগে দীপঙ্কবের মাথায় বক্ত উঠল।

ও দাঁতে দাঁত চেপে বললে, এটা সার্কাসের আবেনা নয় বলেই ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকেই এখানে জোকাবের খেলা দেখাচ্ছেন এবং অনেকে তা দেখে বেশ আনন্দও পাচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক চেয়াব ছেডে লাফিযে উঠল।—উইথড্র, উইথড্র।

দীপঙ্কর লক্ষ কবে দেখল অধিকাংশ শ্রোতাই তাদের ব্যবহারে বিরক্ত। কিন্তু নিরুপায়।

একজন সাহস করে বলেও বসল, ডক্টর রয়, আপনাব বক্তব্য আপনি বলে যান।

আবেকজন শ্রোতাদের উদ্দেশে বললে, আমাদের শুনতে দিন।

কিন্তু তার আগেই সেই দলের মধ্যে থেকে একজন বললে, আপনার ভ্যাকসিনের সঙ্গে গোনাডোট্রপিনের কি সম্পর্ক?

আবেকজন বললে, ঐ হরমোন দিলে বন্ধ্যা গর্ভবতী হবে তার প্রমাণ কি?

দীপঙ্কর বোঝাবার চেষ্টা করল, আমি ওটাকে মিডিয়া হিসেবে ব্যবহার করেছি। একটা টক্সিক এফেক্ট এলিমিনেট করার জন্যে। আমি বলছি না এর ফলে বন্ধ্যাত্ব দূর হবে, কিন্তু একটা পসিবিলিটি দেখতে পেয়েছি, সে-কথাই বলেছি। আই ডোন্ট ক্লেম দ্যাট।

অমনি আবেকজন চিৎকার কবে প্রশ্ন কবল, গোনাডোট্রপিন আপনি পেলেন কোত্থেকে ? ওটা তো ইমপোর্ট করতে হয়। আপনার ইমপোর্ট পারমিট দেখান।

দীপঙ্কর বললে, ঘোড়ার রক্ত থেকে আমি·····

—ঘোড়াব রক্ত ?

সমবেত স্ববে অট্টহাসে হেসে উঠল সেই দলটি।

আবেকজন চিৎকার করে বললে, অশ্বমেধ যজ্ঞটা কোথায কবেছেন জানতে পারি কি ?

আর ঠিক তখনই কে দীপঙ্করেব হাত ধবে টানল।—দীপঙ্কবদা, চলুন, চলুন।

দীপঙ্কর ফিবে তাকিয়ে দেখল অমূল্য। অমূল্য যে এই সভায এসেছে দীপঙ্কব জানত না।

অমূল্য ওব হাত ধবে টানতে টানতে নিযে এসে ওর গাডিতে তুলল। ওদেব অফিসের গাড়ি।

দীপঙ্করকে তখন অসহায এবং বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে অমূল্যব মনে হল এখনই চোখে জল আসবে। মাথা নিচু কবে বইল দীপঙ্কর। অমূল্য ভাবল, হযতো লজ্জায অস্বস্তিতে ওব দিকে তাকাতে পাবছে না।

গাডিটা স্পিডে ছুটতে শুরু করেছে তখন।

দীপঙ্কর হঠাৎ বললে, অমূল্য ! এ-বকম হচ্ছে কেন বলো তো, বুকের ভিতবে কি রকম একটা যন্ত্রণা !

অমূল্য দীপঙ্কবেব মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পাবল অসহ্য কোনও কষ্ট হচ্ছে। সাবা মুখ দবদর কবে ঘামছে।

ও ভয় পেযে গেল।—কোন হাসপাতালে যাবেন দীপঙ্কবদা ? খুব কষ্ট হচ্ছে ?

দীপঙ্কব কোনও বকমে বললে, হাসপাতাল ? ডাক্তার ? না অমূল্য, যদি হার্ট অ্যাটাকও হয, আই ওযান্ট টু ডাই ইন পিস। আমাকে বাডিতে, সীমার কাছে নিয়ে চলো।

অমূল্য কি কববে ঠিক করতে পারল না। ভাবল বাড়িতেই পৌঁছে দিই, ওখান থেকেই কোনও হার্ট স্পেশালিস্টকে ডাকবে। এখন আব অমূল্যও কোনও হাসপাতাল বা ডাক্তারেব ওপর ভরসা বাখতে পারছে না। কে শত্রু আব কে মিত্র চিনে বের কবা মুশকিল। কে সত্যিই চিকিৎসক, আর কে টাকা রোজগারের যন্ত্র তা খুঁজে বের করা যাবে না।

অমূল্য অবাক হয়ে গেছে। এই একটা মাত্র ঘটনা যেন ওর চোখ খুলে দিয়েছে। ও একজন রিপোর্টার, এবং নিজেকে এতদিন অত্যন্ত দাযিত্বজ্ঞানসম্পন্ন বিপোর্টাব ভেবে এসেছে। সমাজেব কোথায কি গলদ দেখতে পেয়েছে, এবং দেখিয়েছে। কিন্তু এই প্রথম ওব মনে হল এতদিন ও এই সমাজটাই দেখেনি। আসলে ও এইমাত্র যা দেখে এল তা শুধু একটা সভা নয়। যেন এই দেশেবই একটা ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি।

এই শিক্ষিত সমাজের প্রতীক যেন। এই উচ্চশিক্ষিত সমাজের। এবা শুধু ডাক্তার নয়, এরাই বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা, গবেষক, সরকারি আমলা, বাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, অধ্যাপক। এরাই দেশ। এরাই সমাজ। এদের মধ্যে একটা ছোট্ট দল ঈর্ষায় জ্বলছে, স্বার্থে আঘাত লাগলে অন্ধ, জ্ঞানীকে সম্মান জানাতে জানে না, গুণীকে বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না। এরা শুধু দল গড়তে জানে। এরা চিৎকার করে, হট্টগোল বাধায়, অপরকে শুনতে দেয় না। এরা মুষ্টিমেয়, কিন্তু নির্বিরোধ সকলের ওপর কলঙ্ক লেপে দেয়। কেউ একজন ওদেব ছাড়িয়ে উঠছে দেখলে তাকে টেনে নামাবার

জন্যে সমস্ত দেশটাকেই তলিয়ে দেয়।

শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছে অমূল্য। তাদের মুখেব ওপর বিশ্বাস লেখা ছিল। তারা গর্বিত। তারা শুনতে চেয়েছে, বুঝতে চেয়েছে।

কিন্তু একটা ছোট্ট দলের ষড়যন্ত্রের কাছে তাবা কত অসহায়। কাবণ তাবা নির্বিরোধ। তারা প্রতিবাদ করে না, প্রতিবোধ করে না। তাদেব গলাব স্বর ক্ষীণ।

তুমি অধ্যাপক, ভাবছ ওটা ডাক্তারদের ব্যাপাব। তুমি হার্ট স্পেশালিস্ট, ভাবছ ওটা গাইনিরা করেছে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি শিল্পী, সবে দাঁড়াতে চাইছ তোমাব সাহিত্যেব বা শিল্পের জগতে। তুমি পদার্থ বিজ্ঞানী, কল্পনাও কোর না, তোমাব ল্যাববেটরিব দরজা বন্ধ থাকলেই তুমি নিশ্চিন্ত। তুমি বাজনৈতিক নেতা, শোষণ থেকে মুক্ত করাব আগে এদের শাসন থেকে মুক্ত হও। তুমি সরকারি আমলা, এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তুমি বাঁচতে পাববে না। তুমি যত সাধারণ হও, যত খাটো মাপেরই হও, তোমার আপন ভূমিতে দাঁড়িযেও তুমি একদিন দীপঙ্কর হয়ে যাবে। তুমি যদি ভেবে থাকো নির্বিরোধ নির্বিকার থাকলেই বেঁচে যাবে, ভুল ভেবেছ। তোমবা সকলে মিলে আজ দীপঙ্কব বাযকে একা কবে দিযেছ, একদিন তুমিও একা হযে যাবে, কেউ তখন পাশে এসে দাঁডাবে না।

—দীপঙ্কবদা, এখনো কি কষ্ট হচ্ছে?

বাডিব কাছে এসে অমূল্য জিগোস কবল।

দীপঙ্কব শুধু মাথা নেড়ে বললে, না।

বাডির দবজায় তখন গাডি এসে দাঁডিযেছে। অমূল্য গাডি থেকে নেমে হাত বাডিযে দিল, বললে, আসুন।

দীপঙ্কব হাসল, নিজেই নামতে নামতে বললে, তুমি আব হাত বাডিযে কি করবে অমূল্য। আমাকে তো একা একাই হাঁটতে হবে। এখনও অনেকখানি বাস্তা বাকি।

অমূল্য কোন জবাব দিতে পাবল না।

দীপঙ্কবকে এখন অনেকটা সুস্থ লাগছে। তাব মুখেব দিকে তাকিযে অমূল্য বুঝতে পাবল তেমন ভয়েব কিছু নেই।

তবু সীমাকে একটু সাবধান করে দিল।—দবকাব হলেই আমাকে ফোন কববেন।

দু-এক কথায অমূল্য একটু আভাস দিযেছে। তাই সীমাব চোখে উদ্বেগ। বললে, আমাবই ভুল, আমিই জোব কবে ওকে পাঠালাম।

দীপঙ্কব প্রসঙ্গটা চাপা দেবাব চেষ্টা কবল। সব শুনলে সীমা আবও কষ্ট পাবে। ও তো এতকাল কষ্টই পেযেছে। আব পাঁচটা মেযের মত বিলাস সম্পদ অহঙ্কাব চাযনি। শুধু চেয়েছিল ও যাকে সাফল্য মনে করে তাব চূডায পৌঁছে দেবে দীপঙ্কবকে। ওকে আলো ঝলমল মঞ্চে তুলে দিযে অভিভূত দর্শকেব মত দেখবে।

—তুমি যাও ভাই, তোমাকে তো আবাব মিটিং-এব খবব লিখতে হবে। সীমা বললে।

আর অমূল্য বিব্রত মুখে বললে, না সীমাবৌদি। আমাকে খবব লিখতে হবে না। আমি এখন সকলেব চোখে আপনাদেব লোক হযে গেছি।

একটু থেমে বললে, আমাব অপবাধ আমিই স্কুপ কবেছি। দীপঙ্করদাব ওপব যাবা ঝাঁপিযে পড়েছে তাদের থাবাব নখগুলো দেখা যায। আমি তো সামান্য একজন রিপোর্টাব, নখগুলোও তাই ছোট, চোখে দেখা যায না।

বলে হাসল। বললে, কাল কি রিপোর্ট বেবোবে আমি জানি। দীপঙ্কবদাকে নস্যাৎ কবতে পারলে আমার স্কুপটাও নস্যাৎ কবা যাবে। আমাকেও।

অমূল্য দীপঙ্কবেব দিকে তাকাল। একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ মানুষ, বিভ্রান্ত। কেন এমন হল যেন ভাবতেই পারছে না। সমস্ত ব্যাপাবটা ওঁর কাছে দুর্বোধ্য। বালিশে পিঠ দিয়ে খাটেব

ওপর পা ছড়িয়ে আধ-শোয়া এক রুগীব মত।

অমূল্য একবার দীপঙ্করেব মুখের দিকে তাকাল, একবার সীমার মুখের দিকে। বললে, বাট আই উইল নট রেস্ট। এটা তো শুধু দীপঙ্করদার আবিষ্কাব করা ভ্যাকসিন নয়। এটা সারা দেশের সাবা সমাজের কথা। ঠিক এইভাবেই আমাদের দেশটা চলছে। কেউ কোন ভ্যাকসিন চায় না, কারণ রোগেব বীজাণু যে সমাজেব ওপর তলাতেই।

সীমা হেসে বললে, তুমি আবার এব মধ্যে ফিলজফি নিয়ে আসছ!

অমূল্য বললে, এতদিন তো আপনি আমাকে সিনিক বলতেন। চোখ খোলা রাখলে মানুষেব সিনিক হওয়া ছাড়া উপায় কোথায বলুন।

দীপঙ্কর এতক্ষণ চুপ কবে ছিল। ওব বুকের ভেতবে বোধহয কিছু কষ্ট হচ্ছিল। তবু ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করল, অনেকে কিন্তু শুনতে চেযেছিলেন।

একটু থেমে নিঃশ্বাস টেনে ধীবে ধীরে বললে, এরা কারা অমূল্য? এরা কি ভেবেছে এদের হাতেই শেষ বিচাব?

অমূল্য হাসতে হাসতে বললে, এবা কাবা জানেন? যাবা একদিন জগদীশ বসুকে জালিযাত বলেছিল। যারা তাঁকে ল্যাবরেটবিব যন্ত্রপাতিব চুবিব অপবাদ দিযেছিল। এরা সব যুগেই আছে।

দীপঙ্কর হেসে ফেলল।—তুমি কাব সঙ্গে আমাব নাম কবছ অমূল্য।

অমূল্যর কানেও গেল না কথাটা। ও কি যেন ভাবছিল।

—কি ভাবছ? সীমা প্রশ্ন কবল।

আব অমূল্য সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল। বললে, একটা মজাব কথা দীপঙ্কবদা। আমবা বড়ো অদ্ভুত মানুষ, তাই না? আমবা গ্যালিলিওকে নিযে নাটক কবি, হাততালি দিই, তার জন্যে দুঃখও হয, আব দৈবাৎ তেমন কেউ আমাদেব মধ্যে জন্মালে তাব ওপর নৃশংস হয়ে উঠি।

একটু থেমে বললে, প্রতিবাদ না কবাও তো এক ধবনেব নৃশংসতা।

৬

বেশ কয়েকটা দিন অবিজিৎ ব্যানার্জিকে খুবই উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এখন আর নিজেকে নিজের কাছে ছোট লাগছে না।

দীপঙ্করকে নিযে একটা উত্তেজনা দেখা দিযেছিল। একটা আলোড়ন। এখন সব আলোচনা থেমে গেছে।

তার কথা এখন কোনও পেশেন্ট হঠাৎ বললে অবিজিৎ হাসতে হাসতে বলে, হুজুগ। আসলে ও নিজেও তাই মনে করে। অনেকেই মনে কবে।

এই সুন্দর বাড়িটার শান্ত স্নিগ্ধ ভাব যেন অবিজিৎ ব্যানার্জির মনেও।

বাস্তার ওপর ঝুঁকে পড়া ব্যালকনিতে দাঁড়িযে পথেব আনাগোনা দেখছিল অবিজিৎ।

গোপাল এসে বললে, এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক আপনাব সঙ্গে দেখা কবতে এসেছেন। বলে কার্ডখানা এগিয়ে দিল।

অবিজিৎ দেখল। না, পেশেন্ট নয। ডাক্তাব। তবে কি কনসালটেশনেব জন্যে? কোথাও কল দিতে এসেছে? না। নামের নিচে পবিচযটা দেখেই ভুরু কোঁচকাল। কি হতে পারে?

বলল, বসতে বল।

তারপর পারমিতাকে দেখতে পেযে বললে, দেখলে তো, দীপঙ্কব একেবারে সাইলেন্ট। তুমি তো সব বিশ্বাস কবে ওকে খেতে বলবে বলেছিলে।

পারমিতা কোনও উত্তর দিল না। সেদিন অরিজিৎ বাধা দিয়েছিল বলেই। বলেছিল, দ্যাখো, এখনই লাফালাফি করো না, ভাল করে ব্যাপারটা জানতে দাও।

কিন্তু এখন অরিজিৎ উদার হতে পেরেছে। কাবণ, দীপঙ্করের ঐ আবিষ্কারের ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে গেছে। যাবা বিশ্বাস করেছিল তাদেরও মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। এখন অরিজিতের বুকে কোন জ্বালা নেই। এখন আর দীপঙ্কর সকলকে ডিঙিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে অহঙ্কারে হাসছে না।

টেলিফোনে কংগ্র্যাচুলেট করতেই দীপঙ্কব বলেছিল, আই হ্যাভ ডান ইট, আই হ্যাভ ডান ইট। আর তা শুনে অরিজিৎ ব্যানার্জির মনে হয়েছিল, এরই মধ্যে দীপঙ্কর কি অহঙ্কারী হয়ে গেছে।

সেই রাগ থেকে, নাকি ঈর্ষা থেকে, বামানন্দকে বলেছিল ডিরেক্টবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। রামানন্দকে ও চেনে। যোগাযোগের অর্থ কি তাও বোঝে। সেজন্যই দীপঙ্করের বক্তৃতা শুনতে যায়নি। রামানন্দও যায়নি। বামানন্দ বলেছিল, যাওয়ার দরকাব কি। দেখোই না কি হয়।

খবরের কাগজে সেই সভাব বিববণ পড়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠেছিল। রামানন্দকে ফোন করে বলেছিল, হাসতে হাসতেই বলেছিল, খববটার মধ্যেও তোমার হাত দেখছি যেন।

রামানন্দ হেসেছে।—না না। আমি তো ভাবছিলাম ডিবেক্টবেব হাত আছে। তারপর বললে, তা নয় অবশ্য। আসলে দীপঙ্কর রায়ের এমন মিজাবেবল অবস্থা দেখে বিপোর্টারই বা আর কি লিখতে পাবে।

সভার বিবরণ পড়ে পাবমিতা কিন্তু খুব মুষড়ে পড়েছিল। এত মুষডে পডার কি আছে অরিজিৎ বুঝতে পারে না। আসলে মেয়েদের মাথায বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম, চট্ করে বিশ্বাস করে বসে।

খবরের কাগজটা দেখিয়ে অরিজিৎ বলেছিল, দেখেছ? আমি যা বলেছিলাম, ঠিক তাই। সমস্ত ব্যাপাবটাই একটা বিগ হোক্স। দীপঙ্কব একটা প্রশ্নেবও জবাব দিতে পাবেনি।

কথাটা বলতে গিযে ভিতরের উল্লাস চাপা দিতে পাবেনি অরিজিৎ। তবু মনেব মধ্যে আশঙ্কা ছিল। দীপঙ্কব হযতো খববের কাগজে কিছু একটা জবাব দেবে। সমস্ত বিষযটা ব্যাখ্যা করবে।

কিন্তু অনেকগুলো দিন তো পার হযে গেল। দীপঙ্কর একেবাবে চুপ কবে গেছে। ঐ যে একটা এনকোয়ারি কমিটি বসানোব ভয দেখানো হযেছে খবরেব শেষে। বোধহয় সেজন্যেই ঘাবড়ে গেছে।

ও তো একটা ফাজিল ছোকবা। কোনও ব্যাপারে সিবিয়াসনেস নেই। প্র্যাকটিস জমাবাব চেষ্টাও করল না, চেষ্টা করলেও পাবত কিনা কে জানে। অনেকগুলো গুণেব সমাবেশ হলে তবেই নামী চিকিৎসক হওয়া যায়। একটা প্রতিভার ব্যাপার আছে, কিংবা দৈবশক্তি। অরিজিৎ ওসব বিশ্বাস করে, মনে হয় মঙ্গল আর শনিবার ওর পক্ষে শুভ, যেদিন যেদিন ছুরি ধরে গলায় একটা পেণ্ডেন্টের মত সোনায় বাঁধানো মাদুলি থাকে।

ও খুব ঈশ্বরবিশ্বাসী।

স্বাস্থ্য দপ্তরের এক বড়সড় আমলা অরিজিতের খুব বন্ধু। একসময় পেশেন্ট ছিল। ফোন করে জিগ্যেস করেছিল একটা এনকোয়ারি কমিটি বসানো যায কিনা। কিছুই তো দীপঙ্কর রায় বলতে চাইছে না, হি শুড বি ফোর্সড টু ক্লাবিফাই···

তারপর হঠাৎ জিগ্যেস কবেছে, আপনার কি মত?

অরিজিৎ সম্মতি জানিয়েছে। বলেছে, অবশ্যই, আপনাদের সে রাইট আছে। আফটার

অল সে তো গাভমেন্ট সার্ভেন্ট।

অরিজিৎ নিজেও তাই। ও রামানন্দর মত স্বাধীন নয়। ওর এ ধরনেব কোনও ব্যাপারে স্বাস্থ্য দপ্তর নাক গলাতে এলে নিশ্চয় চটে যেত। আমার চাকরির এলাকার বাইরে তোমাদের হস্তক্ষেপ কবার অধিকার কোথায় পেলে ? আসলে স্বাস্থ্য দপ্তরেব সঙ্গে অরিজিৎ ব্যানার্জির মত নামী এবং উচ্চপদস্থ ডাক্তারদের বেশির ভাগেরই একটা বিচিত্র সম্পর্ক আছে। ভিতরে ভিতরে পারস্পরিক রেষারেষি থাকলেও। একপক্ষের ধারণা, তুমি যত বড় ডাক্তারই হও, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের দিক থেকে তুমি আমাদের অধীন। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলতে অবশ্য কোথাও সীমারেখা টানা আছে তা ওরা বিশ্বাস করে না। অন্যপক্ষ যথাসাধ্য স্বাধীন থাকার চেষ্টা করে, তবে মানিয়েও চলে। আমলাদের অকারণে চটিয়ে দিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করে লাভ তো কিছু নেই।

অরিজিৎ এনকোয়ারিব ব্যাপারে সায় দিয়েছে। কিন্তু দীপঙ্করকে জব্দ কবার জন্যে নয়। ও তো একটু পাগলাটে ধরনের, হয়তো ঠাট্টা-তামাশা করেই, কিংবা নিউজে আসবার জন্যে, হয়তো কোনও রিপোর্টারকে বলেছিল। শেষ পর্যন্ত সেটা যে হৈ চৈ বাধাবে ভাবেইনি। এখন সে চুপ করে গেছে বলেই অবিজিতেব আর বিশেষ কোনও রাগ নেই। ববং দীপঙ্করের জন্যে মায়া হচ্ছে। বেচাবা এখন উদ্ধার পেয়ে গেলে অরিজিৎ খুশি হয়। কিন্তু এনকোয়ারিব ব্যাপারে সায় না দিয়ে ওব উপায় নেই। কাবণ ওব বুঝতে অসুবিধে হয়নি, এর পিছনে আরো হোমরাচোমরা কেউ আছে। ডিরেক্টর ? সেক্রেটারি ? মন্ত্রী ? কে জানে কে। এখন বেচারার চাকরি নিয়ে টানাটানি না হলেই অবিজিৎ নিশ্চিন্ত হতে পারে।

কিন্তু কেউ কিছু একটা আবিষ্কার ক্লেম কবলে কি সরকারী এনকোয়ারি কমিটি বসে ? কখনো বসেছে ? অবিজিৎ ঠিক জানে না।

এ-সব তো সায়েন্স কংগ্রেসে পড়া হয়, জার্নালে বেরোয়।

যাদের যোগ্যতা আছে তাবা মতামত দেয়। নানা দেশে আলোচনা হয়, এক্সপেরিমেন্ট হয়, তারপর স্বীকৃতি পায় বা পায় না।

জগদীশ বসুকে নিয়ে কি সরকাবী এনকোযাবি হয়েছিল ? মেঘনাদ সাহা কিংবা সত্যেন বোস ? খুব একটা বড় আবিষ্কাব না হলেও মেডিকেল সায়ান্সেও তো ছোটখাটো আবিষ্কাব অনেকেই করছে, পেপার পড়া হয়, জার্নালে বেরোয়। কই সে-সব নিয়ে সরকারী এনকোয়ারির কথা মনে পড়ে না।

হঠাৎ দীপঙ্করকে নিয়েই বা এ-সব হচ্ছে কেন ? অরিজিতের কাছেও রহস্য ঠেকেছে। খববটা ওর খুব ভাল লাগেনি, একটু ঈর্ষা হয়েছিল ঠিকই, কেমন যেন মনে হয়েছিল ছোট হয়ে গেলাম। বিশ্বাসও হয়নি। মনে হয়েছে ব্লাফ। কিন্তু দীপঙ্করকে নিয়ে এই এনকোয়াবির ব্যাপারটাও ভাল লাগছে না। তোমরা কে হে ?

অরিজিতের নিজেকে বড়ো অসহায় লাগছে। ইচ্ছে হচ্ছে ফোন করে জানিয়ে দেয়, শুধু মাসে মাসে কটা টাকা মাইনে দেন বলে কি আমাদের আপনারা কেনা গোলাম ভাবেন ? আমি কি নিয়ে রিসার্চ করি বা না কবি তার সঙ্গে আপনাদের কি সম্পর্ক ! তার জন্যে অনেক জ্ঞানীগুণী লোক সারা পৃথিবীতেই আছে। আপনারা কে মশাই ?

কিন্তু, অরিজিৎ ভেবে দেখল, তা সম্ভব নয়। ঐ আমলাদের কাছে ও বড়ই অসহায়। কারণ ডিরেক্টর থেকে শুরু করে কেরানি অবধি সকলেই ওকে খাতির করে। চাকরির জীবনে আরও ওপরে ওঠার সিঁড়িতে ওরা সহায় হবে বলে নয়। আসলে কারও ভাল জায়গায় বদলি বা কলকাতায় ফিরিয়ে আনা, কাবও গাফিলতি ধরা পড়লে তাকে বাঁচানো, কারও প্রোমোশন, এসব বিষয়ে ওরা কিন্তু অরিজিতের অনুরোধ রাখার চেষ্টা করে। সম্ভব হলে করেও দেয়। এও তো এক ধরনের প্রতিপত্তি। এটা তো পারস্পরিক সম্পর্কের

ওপরেই নির্ভর করে। সবক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় বিচার করলে চলে না।

তেমন সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটলে তখন দেখা যাবে।

অবিজিৎ নিজেই তখন দীপঙ্করকে বাঁচাবে।

কিন্তু দীপঙ্করের কি একবার আসা উচিত ছিল না? অবিজিৎ ভদ্রতা করে বলেছে, যাব একদিন। সেই কংগ্র্যাচুলেট করার দিন বলেছিল। অবিজিৎ উঁচু ধাপের যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে 'যাব একদিন' বলাই যথেষ্ট সম্মান। দীপঙ্করের তো নিজেরই আসা উচিত ছিল।

চা শেষ করে ভিজিটিং কার্ডটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল অবিজিৎ। আরে, ঐকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি! ডক্টর স্বামীনাথন! কই মনে পড়ছে না। আলাপ নেই। কিন্তু নামের পরে বিদেশী ডিগ্রিগুলো চোখে পড়ল, ক্ষুদে অক্ষরের পরিচয়ও।

নেমে এল। বসিয়ে রাখার জন্যে ক্ষমা চাইল অমায়িক হাসির পরে ব্যস্ততা জানিয়ে।—বসুন, বসুন।

—আমি ম্যাড্রাসে একটা লেপ্রসি হোম চালাই।

স্বামীনাথন গুরুগম্ভীর মুখে বললেন, আমাদের ওদিকে এটা একটা বিরাট প্রবলেম। আমি বিলেতে এ-বিষয়েই পড়াশুনো করতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে নিজেই একটা লেপ্রসি হসপিটাল শুরু করি।

অবিজিতের ভুরু কুঁচকে উঠল। কৌতূহল জাগল। লেপ্রসি!

—বলুন কি করতে পারি আমি?

স্বামীনাথন হেসে বললেন, না না, তেমন কিছু নয়। আসলে আমি ডক্টর রয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। একটু থেমে বললেন, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেঙ্গলিজ!

একটা ক্রুদ্ধ বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল অবিজিতের কপালে। 'হোয়াই?'

স্বামীনাথন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, না না, আপনাকে বলছি না। ডক্টর রয়কে যে কজন কংগ্র্যাচুলেট করেছেন, আপনিও তাদের মধ্যে একজন। আই নো দ্যাট। ডক্টর রয় আমাকে বলেছেন। আমি সেজন্যেই দেখা করতে এলাম।

কথাটা অবিজিতের বুকের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধল। কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না।

স্বামীনাথন বললেন, কিছু মনে করবেন না গ্রেটনেস যতক্ষণ না অ্যাকসেপ্টেড হয় ততক্ষণ আপনারা তাকে খুন করার জন্যে নৃশংস হয়ে ওঠেন। আর যখন অ্যাকসেপ্টেড হয় তখন তাকে এমন মাথায় তোলেন যেন পৃথিবীতে আর কোথাও কোনও গ্রেট ম্যান জন্মায়নি।

অবিজিৎ বোঝবার চেষ্টা করল, লোকটা কোথায় যেতে চাইছে।

—আপনার আসল কথাটা বলুন এবার। অবিজিৎ বললে।

ডক্টর স্বামীনাথন বললেন, উনি কিন্তু সত্যি একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন। লেপ্রসির। ইট উইল ইরাডিকেট দি ডিজিজ ফ্রম দি ওয়ার্লড। আমি গোড়া থেকেই জানি। টক্সিক এফেক্ট নেই।

অবিজিৎ ভিতরে ভিতরে বিব্রত বোধ করছিল, ঠিক এরকম একটা ওকালতি শুনতে হবে ভাবেনি। বলল, এত তাড়াতাড়ি ক্লেম করা উচিত হয়নি ওর। আফটার অল মানুষের ওপর প্রয়োগ না হলে.....

—হয়েছে। রিমার্কেবল রেজাল্ট। বিলিভ ইট অর নট।

অবিজিৎ চমকে উঠে বলল, কোথায়?

স্বামীনাথন মাথা নামিয়ে বললেন, আই কান্ট সে দ্যাট, আপনি ওঁর হিতৈষী জেনেই বললাম, হয়েছে।

তারপর স্বামীনাথন হাসতে হাসতে বললেন, সমস্ত রিপোর্ট আমি বাইরে পাঠিয়েছি, অ্যাব্রড। দু দুটো জায়গা থেকে ওঁর ইনভিটেশন আসছে। ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ ওয়েটিং ফর হিম। অ্যান্ড ফর আস, ইন্ডিয়ানস্ !

অরিজিতের মুখ দিয়ে কোনও কথা সরল না।

স্বামীনাথন বললেন, হি ইজ কমপ্লিটলি রান ডাউন। ডক্টর রয়। এ-রকম বিহেবিয়ার উনি আশাই করেননি।

হাসতে হাসতে বললেন, আমি জানি না, আসল ব্যাপারটা ছেড়ে কয়েকজন গাইনি কেন গোনাডোট্রপিন নিয়ে পড়ল।

তারপর ঝপ করে অরিজিতের হাতটা ধরলেন স্বামীনাথন। অরিজিৎ আঁতকে উঠে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। যেন ঐ লেপ্রসির ডাক্তারের হাতেও লেপ্রসি আছে। বইয়ে পড়েছে এত চট্ করে ইনফেকশন হয় না, অপরকে বুঝিয়েছে। কিন্তু সংস্কার যাবে কোথায়।

স্বামীনাথন বললেন, ডক্টর রয় একেবারে ডিসগাস্টেড। ডিজেক্টেড। আপনি ওঁকে একটু বোঝাবেন, ইনভিটেশন যেন অ্যাকসেপ্ট করেন। বেঙ্গলিজ মে নট, বাট হিউম্যানিটি ডিম্যান্ডস ইট।

স্বামীনাথন চলে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অরিজিৎ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

যাবার সময় ও স্বামীনাথনকে সাবধান করে দিয়েছে, এটা নিয়ে ওর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত নয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি দীপঙ্কর একটা আনএথিক্যাল ব্যাপার করেছে, এবং আপনিও। ইউ উইল বি ইন ট্রাব্‌ল।

অরিজিতের একবার মনে হল, বাজে কথা। ওসব ভাঁওতা। পরক্ষণে মনে হল, কি দুঃসাহস। গভর্নমেন্টের পার্মিশন না নিয়ে এ-রকম একটা কাণ্ড কেউ করতে পারে? মানুষের ওপর প্রয়োগ করেছে লুকিয়ে লুকিয়ে? জানাজানি হলে ওকে তো কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

কিন্তু সবচেয়ে দুর্ভাবনা, ইনভিটেশন আসছে। ফ্রম অ্যাব্রড।

—রামানন্দ, যদি জালিয়াতি হয় কি-দুর্নামই না হবে ইন্ডিয়ানদের। সেখানে গিয়ে যদি ধরা পড়ে বাঙালী আর মুখ দেখাতে পারবে না।

স্বামীনাথন চলে যেতেই ফোন করে রামানন্দকে জানিয়ে দিলে অরিজিৎ।

রামানন্দ হাসতে হাসতে উত্তর দিল, নিশ্চিন্ত থাকো, এনকোয়ারি কমিটি ওর বিষ দাঁত ভেঙে দেবে।

পারমিতা শুনছিল। কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। অরিজিতের কথা শুনল, কিন্তু রামানন্দর কথা শুনতে পেল না।

হঠাৎ বললে, কিসের দুর্নাম?

অরিজিৎ বিব্রত বোধ করল। পারমিতা তো বিশ্বাস করে বসে আছে। কিন্তু অরিজিতের মনের মধ্যে যে কি চলছে তা ও বুঝবে না। ও টাকা জানে, বাড়ি জানে, গাড়ি জানে। মেডিকেল কলেজের চাকরির ডেজিগনেশন জানে। তারও বাইরে কিছু আছে তা জানে না। কিংবা তাও জানে। এবং সেটাকেই বড় করে দেখে। দেখছে।

কত নির্দোষ সারল্যে বলে বসেছিল। —তোমরা তো ডাক্তার। যেন ডাক্তারিটা বিজ্ঞান নয়, যেন ডাক্তাররা বিজ্ঞান বোঝে না।

অরিজিৎ বললে, দীপঙ্কর বাইরে থেকে ইনভিটেশন পাচ্ছে। সেখানে গেলে ধরা পড়বেই, তখন আমাদের দুর্নাম, দেশের দুর্নাম।

পারমিতা শব্দ করে হেসে উঠল।—তোমরা এত দেশের কথা ভাব।

তারপর বললে, জানো, রেডিও নিয়ে জগদীশ বসুরও দুর্নাম হয়েছিল। এখন কিন্তু

অনেকেই স্বীকার করছে, বিদেশীরাই।

অরিজিৎ বিরক্তির সঙ্গে বলল, যার তার সঙ্গে জগদীশ বসুর নামটা এনো না।

পারমিতা কেমন অদ্ভুত ভাবে অরিজিতের মুখেব দিকে তাকাল।

অরিজিতের মনে হল ঐ দৃষ্টিটা যেন বলতে চাইছে, ইউ আর জেলাস!

কেমন অসহ্য লাগল। কোনও কথা না বলে গাম্ভীর্যের সঙ্গে সবে গেল, প্রচণ্ড রাগ হল পারমিতার ওপর। বুকের ভেতর থেকে একটা নৃশংস ক্ষোভ যেন অনেকগুলো ধারাল নখ উঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। যাব আরেক দিকে ঠেলে বেরোতে চাইছে অক্ষম কান্না। তোমার জন্যেই। তুমি তো সুখ চেয়েছিলে, বিলাস চেয়েছিলে। প্রতিষ্ঠা, পরিচয়। তাব মধ্যেই আমাকে সারাটা জীবন বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছে। তা না হলে আমিও পারতাম কোনও অসাধ্য সাধন করতে, দীপঙ্করের মতই। এখন আমার ঈর্ষা ছাড়া কিছু করার নেই।

পারমিতার ওপর রেগে যাওয়ারও উপায় নেই। তাহলে ওর চোখে অবিজিৎ আরও ছোট হয়ে যাবে।

রাগটা সেজন্যেই শুধু দীপঙ্করের ওপর। দীপঙ্কব নিজেকে বড়ো বেশি চতুর ভেবেছে। সন্দেহ নেই স্বামীনাথনকে দীপঙ্করই পাঠিয়েছিল। হয়তো ওর এই অসহায় মুহূর্তে চাইছে অরিজিৎ ওর হয়ে প্রকাশ্যে দাঁড়াক।

অরিজিৎ মনে মনে হাসল।

গোপালকে বলল, বড় গাড়িটা বেব করতে বল্।

সটান চলে এল বামানন্দর নার্সিং হোমে।

রামানন্দ ওকে দেখতে পেয়েই বললে, চলো, চলো, কথা আছে।

একটা নির্জন ঘরে মুখোমুখি বসল দুজনে।

রামানন্দ বললে, তোমার দীপঙ্কর তো বীতিমত দল পাকাচ্ছে। ডাক্তার বিশ্বাস সেদিন মুখের ওপরই বললেন, উনি বিশ্বাস করেন। এখন দেখছি, কয়েকজন স্কিন স্পেশালিস্ট, ম্যাড্রাসের ঐ স্বামীনাথন, এমন কি দু-চারজন গাইনিকেও দলে টেনেছে।

ভাবছে এইভাবেই ভাঁওতা দিয়ে চালাবে। কিন্তু আমরা ওর মুখোশ খুলে দেব।

একটু থেমে বললে, আমবা দলে ছোট, কিন্তু আমরাই পাওয়ারফুল। তাছাড়া এথিকস আমাদের দিকে, আইন আমাদের দিকে।

অরিজিৎ বলল, আমাদের তো কোনও দল নেই। উই আর অন দি সাইড অফ ট্রুথ। যা ট্রুথ তা তদন্ত করে বের কবতে হবে। ও যদি প্রমাণ কবতে পারে, করুক না।

রামানন্দ বললে, ও যদি লেপ্রসির ভ্যাকসিন নিয়ে একটা ব্লাফ দিত, কিছু বলতে যেতাম না। কিন্তু ও আমাদের ভাতে মাছি ফেলেছে। বন্ধ্যাত্ব দূর করে দেবে। হোয়াট এ ক্লেম!

অরিজিৎ বলল, কিন্তু এনকোয়ারি কমিটি যদি বিশ্বাস করে বসে।

রামানন্দ হেসে উঠল।

—আইডিয়াটা আমাবই। ও তো সেক্রেটারি, ডিরেক্টর তাদের কাছেও অডাসিটি দেখিয়েছে। দু হাত নেড়ে বলেছে, নাথিং টু অ্যাড। সেটাই সুবিধে হয়েছে।

অবিজিৎ বলল, ও পাগল হয়ে গেছে। ও যদি আমাদের সাহায্য চাইত, একটু বিনয় দেখাত, আমরা নিশ্চয় বিরুদ্ধে যেতাম না। কিন্তু এনকোয়াবি কমিটি নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা।

রামানন্দ বললে, এনকোয়ারি কমিটিতে কে কে থাকবে কথা হয়ে গেছে।

—কে কে?

রামানন্দ হাসল।—একজন তুমি।

—আমি ? আঁতকে উঠল অরিজিৎ।—না, না, তা সম্ভব নয়। আমি ফোরফ্রন্টে আসতে পারব না। আমার স্ত্রী, কন্যা, তারা তো এখন দীপঙ্কর বলতে অজ্ঞান। মেয়ে আবার জিগ্যেস করছিল, নোবেল প্রাইজ পেয়ে যেতে পারে কিনা।

রামানন্দ শব্দ করে অট্টহাসে হেসে উঠল।

তারপর বললে, তাহলে দেখি আরেকজন কাউকে।

—কিন্তু কমিটিতে আর কারা থাকবে ?

রামানন্দ বললে, আমাদেরই লোক। একজন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট, একজন আই এ এস, একজন অ্যাসট্রনমির প্রফেসর, দুজন গাইনি, আর চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর।

অরিজিৎ বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকাল।—ওরা কি করবে ? এটা তো লেপ্রসির ভ্যাকসিন।

রামানন্দ হাসতে হাসতে বললে, কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট তো করেছে ইঁদুর, খরগোশ, বাঁদরের ওপর। জীবজন্তু নিয়ে কাণ্ড, সেজন্যেই চিড়িয়াখানা।

অরিজিৎ নির্বোধের মত প্রশ্ন করল, অ্যাসট্রনমি কেন ?

রামানন্দ গম্ভীর মুখে বললে, দীপঙ্কর তো বলেছে, এটা সায়েন্সের ব্যাপার। সেজন্যেই একজন সায়েন্টিস্ট রেখেছি। আই এ এস দরকার, আইনকানুনের জন্যে। ওর এক্সপেরিমেন্টের জন্যে কখন হেলথ ডিপার্টমেন্টের পারমিশন দরকার ছিল, ডিউটি আওয়ার্সে এ-সব করেছে কিনা। গাইনিরা প্রশ্ন করবে ঐ উদ্ভট ক্রেম সম্পর্কে, গোনাডোট্রপিন !

তদন্ত কমিটির সামনে উপস্থিত হবার নির্দেশ পেয়ে দীপঙ্কর রায় যথাস্থানে এবং যথাসময়ে এসে হাজির হল।

দেখে মনে হল একটা ভেঙে পড়া মানুষ যেন শেষ মুহূর্তে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ও বুঝতে পারছে, হয় ওকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হবে, অথবা কোনও নগণ্য জায়গায় বদলি করে দেওয়া হবে। হয়তো রাত জেগে এ কদিনে যে পেপারখানা তৈবি করেছে সেটা প্রকাশ করার অনুমতিও দেওয়া হবে না।

ওর অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে। তিন তিনটে মাস, শুধু পেপার্স তৈরি করতে। কখন করবে ? ও তো নিশ্চিন্তে বসতেই পায়নি। সিংহের মুখোশ পরা লোকটা নানান ট্রাবল্ দিয়েছে। এনকোয়ারি কমিটির ভয় দেখিয়েছে। বন্ধু আর আত্মীয়রাও অবিশ্বাস করেছে। হাসপাতালে মুখ টিপে হাসি। এই মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে কি পেপার্স তৈরি করা যায়।

বিশাল ঘরখানার মধ্যে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপঙ্কর।

সেই মুখোশ পরা লোকটা মাঝখানে বসে আছে। মুখোশ উঠে এসে বীভৎস হাসি হেসে ওর সঙ্গে হ্যান্ড শেক করল। তারপর একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

দীপঙ্কর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে পা টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে বসল।

মুখোশ বললে, আপনার এক্সপেরিমেন্টের কথা আমাদের কাছে ডিটেল্‌সে বলুন। সত্যি না মিথ্যে আমরা বিচার করব।

দীপঙ্কর ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বেলে ঠোঁটে ধরা সিগারেটটা ধরাল, এক মুখ ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল, তারপর বললে, আপনারা কে ? আসল বিচারকরা নেই কেন ?

মুখোশ রেগে উঠল।—আসল বিচারক বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ? এখানে সব ফিলডের টপ লোকরা আছেন।

দীপঙ্কর বললে, আপনি হিস্ট্রি পড়েননি। তাই এ-কথা বলছেন।

মুখোশ বললে, ঠিক আছে, আমরা একজন হিস্টোরিয়ানকেও ডাকছি।

দীপঙ্কর বললে, প্রয়োজন নেই। কাবণ, আমি হিস্ট্রি পড়েছি। যে-কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিচারক হয়ে এসেছেন ধর্মযাজক। আপনারা কোনও পুরুত ঠাকুরকে ডাকেননি কেন ?

মুখোশ বললে, আপনি কি আমাদের ঠাট্টা করছেন, নাকি সত্যি পুরুত ঠাকুর চান ?

দীপঙ্কর বললে, হ্যাঁ চাই। কারণ শাস্ত্র পড়ে তিনিই তো বলে দেবেন এ যাবৎ পূর্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে যারা লেপ্রসিতে ভুগে এসেছে, রোগটা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হলে তাদের কি হবে। পৃথিবীতে পাপ বেড়ে যাবে কিনা।

একটু থেমে বললে, একজন জ্যোতিষীকেও ডাকা উচিত।

মুখোশ রেগে গিয়ে বললে, কেন !

দীপঙ্কর হাসতে হাসতে বললে, আপনাদের হাতের আঙুলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারছি আপনারা জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। তাঁকে পেলে আমার কুষ্ঠিটাও একবাব দেখিয়ে নিতাম।

মুখোশ বললে, আমাদের সুমহান ঐতিহ্যের ওপর আপনার যদি বিশ্বাস থাকত তাহলে আপনি এই কাজ শুরু করার আগেই কনসাল্ট করতেন।

দীপঙ্কর হঠাৎ করুণ স্বরে বললে, এখন কিন্তু আমি সবই বিশ্বাস করছি। জ্যোতিষ, গ্রহরত্ন, পুরোহিত এবং পাঁজি। কারণ দেখতে পাচ্ছি, যুক্তি দিয়ে সব কিছুব ব্যাখ্যা কবা চলে না। যেমন আপনারা যে বড় বড় পোস্টে গিয়ে বসেছেন, ক্ষমতাশালী হয়েছেন, কিংবা খ্যাতি পেয়েছেন, তার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, আপনাদের আঙুলের ঐ গ্রহরত্নের অলৌকিক শক্তি ছাড়া এর আর কোনও ব্যাখ্যা নেই।

আর্কিটেক্ট, আই এ এস, গাইনি, চিড়িয়াখানা এবং মুখোশ একসঙ্গে উল্লাস প্রকাশ করল।—ঠিক বলেছেন। ঠিক বলেছেন। আমরা এর অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করেছি।

একজন গাইনি বললে, এবার আপনার ঐ ভ্যাকসিন, যা বন্ধ্যাত্ব দূর করবে, তাব অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করতে চাই।

দীপঙ্কর বললে, আই অ্যাম সরি। আমি আপনাদেব তা দেখাতে পাবছি না, এবং দেখাতে চাই না। আমার শুধু একটাই প্রার্থনা আপনাব কাছে, ডক্টব মুখোশ।

একটু থেমে বললে, আমেরিকা এবং ইংল্যান্ড থেকে দুটো কনফারেন্স অ্যাটেন্ড কবার নিমন্ত্রণ পেয়েছি, সেখানেই পেপারটা পড়তে চাই। আমাকে শুধু যাবাব পার্মিশনটা দিন।

সঙ্গে সঙ্গে এনকোয়ারি কমিটির সদস্যবৃন্দ হৈ হট্টগোল শুরু করল।

—অসম্ভব, অসম্ভব। আমাদের দেশের এবং আমাদের দেশেব এই নোব্‌ল প্রফেশনের সুনাম বিদেশে খর্ব হতে দিতে পাবি না।

মুখোশ অবশ্য উত্তেজিত হল না। বললে, ওটা থ্রু প্রপার চ্যানেল পাঠিয়ে দেবেন। অফিস বিচার করে দেখবে দরখাস্তটা।

অ্যাসট্রনমার ঠাট্টা করে বললে, আপনাব অনুমতির কি দরকাব, আপনি তো চাকরিটা ছেড়ে দিলেই পারেন। আমেরিকা তো আপনাকে লুফে নেবে।

সকলে শব্দ কবে হেসে উঠল।

আর দীপঙ্কর একের পর এক সকলের মুখের দিকে করুণ ভাবে তাকাল। অসহায় ভাবে বললে, প্যাসেজ মানিটাও আমার নেই, ওরা টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে, তাই। পরের মাসের মাইনে না পেলে আমার চলবে কি করে !

মুখোশ বললে, আপনার এই ব্যবহারের পর আপনি নিয়মিত মাইনে পাবেন কিনা আমি সিওর নই।

দীপঙ্কর হঠাৎ অপমানিত বোধ করল। উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠল। বাগ

চাপার চেষ্টা করল, পারল না।

নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হল তার। রাগে অভিমানে চোখ ফেটে জল এল।

ও বুঝতে পারছে একটা অদৃশ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ও কত অক্ষম। ওর সারা জীবনের সাধনাকে ওরা ব্যর্থ করে দিতে চায়। ব্যর্থ করে দেবে। ও কি বিশাল সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেছিল। ওর সঙ্গে সঙ্গে সীমাও। সাকশেসফুল লোকের স্ত্রীদের মত সুখ আর বিলাস খোঁজেনি, অফুরন্ত টাকা চায়নি, বাড়ি গাড়ি, কিচ্ছু না। সীমাকে তার পবিবর্তে সাফল্যের আনন্দ দিতে চেয়েছিল। এখন তাকে কিছুই দেবাব নেই। দীপঙ্কর বেশ বুঝতে পারছে সাফল্য পেযেও তাকে ব্যর্থতার গ্লানি বয়ে বেডাতে হবে। সাবা জীবন। এরা ওকে স্বীকৃতি পেতে দেবে না।

অসহায় ভাবে প্রত্যেকটি মুখের দিকে ও তাকাল। কি নৃশংস হাসি প্রত্যেকের মুখে।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল দীপঙ্কর। ধীরে ধীরে উঠে দাঁডাল। কঠিন চোখে তাকাল ওদেব দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখগুলো কেমন আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল। এইমাত্র যেন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরকেব সলতেয় আগুন ধবানো হয়েছে, দীপঙ্করকে দেখে ওদেব মনে হল।

না। দীপঙ্কর শুধু ওর হাতের ফাইল থেকে টাইপ কবা বিপোর্টের কাগজগুলো বেব করল।

—প্রথম দিন থেকে আপনাবা আমাকে একটুও শান্তি দেননি। আমার পেপার্স তৈবি কবতে তিন তিনটে মাস পাব হযে গেছে। আপনারা কেবল এনকোয়ারি কমিটিব ভয দেখিয়েছেন। এখন আব আমি আপনাদেব একটুও ভয় পাই না।

একটু থেমে বললে, এই আমাব বিসার্চের পেপার্স। দেখুন। বলেই উত্তেজিত ভাবে সেগুলো ছিঁডে টুকরো টুকরো করে আর্কিটেক্ট, অ্যাসট্রনমার, গাইনি, চিড়িয়াখানা, আই এ এস আর মুখোশের মুখে ছুঁডে মাবল।

চিৎকার করে উত্তেজিত ভাবে বললে, আমি একটা স্টুপিড, স্টুপিড। আমি ভেবেছিলাম কুষ্ঠরোগ থেকে মানুষকে বাঁচাব। তাই তাব ভ্যাকসিন বেব কবার পিছনে সারাটা জীবন খরচ কবে দিযেছি। জানতাম না, এই দেশটাই এখন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। একটা সমাজকে কুষ্ঠবোগ থেকে বাঁচানোর কোনও ভ্যাকসিন আমার জানা নেই।

বলেই ঘর থেকে বেরিযে গেল।

৭

পরেব দিনেব কাগজে খবর বের হল। তিন লাইনে লেখা তদন্ত কমিটির বিপোর্ট।

আপামর জনসাধারণ জানতে পারল বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের নিযে গঠিত এনকোয়াবি কমিটির কাছে দীপঙ্কর রায় তাঁর তথাকথিত আবিষ্কার সম্পর্কে কিছুই বলতে পাবেননি। একটি প্রশ্নেবও জবাব দিতে পাবেননি।

জালিয়াত, জালিয়াত।

খবরেব কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পডেছিল দীপঙ্কব। অসহ্য লেগেছিল। এখন আর তাব মধ্যে কোনও হতাশা নেই। রাগ নেই। এখন শুধুই গ্লানি। আমি একটা জালিয়াত, আমি একজন প্রতাবক।

টেলিফোন বাজছিল। একটার পর একটা।

—ডক্টর রায়। আপনি ? ছি ছি, ছি ছি, আমাদের এই নোব্‌ল্ প্রফেশনের নামে আপনি একটা কলঙ্ক লেপে দিলেন ? রাতারাতি বিখ্যাত হওয়ার লোভে ? না না, আমাকে চিনবেন না।

—দীপঙ্কর রায় বলছেন ? আপনার লজ্জা করল না ? ভেবেছিলেন জালিয়াতি ধরা পড়বে না ?

—দীপঙ্করবাবু, সারা ভারতবর্ষে বাঙালী আর মুখ দেখাতে পারবে না। ভাবতেও ঘেন্না করছে।

ছি ছি, ছি ছি, ছি ছি।

দীপু, আমি তোর ছোট মাসী বলছি। হ্যাঁ রে, বড় গলায় গর্ব করে সবাইকে বলেছিলাম, আমার বোনপো। তুই শেষে এমন একটা ধাপ্পা দিতে যাবি কে জানত। পাড়ায় মুখ দেখাতে পারছি না।

অসহ্য, অসহ্য।

দীপঙ্কর রিসিভার পাশে নামিয়ে রাখল, আর কেউ রিং করতে পারবে না। ঐ ক্রিং ক্রিং শব্দটা এখন ওর মাথার মধ্যে পাগলা ঘণ্টি হয়ে বাজছে।

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। দুহাত শূন্যের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রাগে ক্ষোভে বলে উঠল, লেপার্স, লেপার্স অল।

রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে নিরুদ্দেশ ভাবে হেঁটে চলল দীপঙ্কর। বুকে অসহ্য ব্যথা। সারা শরীরে গ্লানি।

মুখ তুলে তাকাতেও ভরসা হয় না।

ওর কেবলই মনে হচ্ছে সারা শহর যেন অট্টহাসে হাসছে ওকে দেখে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, একজন জালিয়াত। একজন প্রতারক।

সীমা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি তোমার কাছে আমার সাফল্যের মুকুট এনে দিতে পারিনি। এনে দিয়েছি শুধু লজ্জা আর অপমান।

কারণ একজন আর্কিটেক্টকে আমি বোঝাতে পারিনি লেপ্রসি কত বড় অভিশাপ। সিংহের মুখোশ-পরা একজন আমলাকে বোঝাতে পারিনি একটা ভ্যাকসিনের কাছে তার পদমর্যাদা এবং অহঙ্কার কত তুচ্ছ। চৌষট্টি টাকা ফিয়ের একজন গাইনিকে বোঝাতে পারিনি বিজ্ঞান তার এলাকা নয়। তুমি ছুরি ধরলেই হাজার টাকা নিতে পারো, তোমার নার্সিং হোম আরও বড় হোক্। কিন্তু তুমি একজন সামান্য মেকানিক। আবিষ্কার কি তা তুমি জানো না। তুমি নিজেকেও কোনওদিন আবিষ্কার করতে পারবে না। সুদখোর মহাজনের মত তোমাদের দৃষ্টি ঐ খেরোর খাতায়, সুদের হিসেবে। কুষ্ঠগ্রস্ত মানুষের দুঃখ তোমরা বুঝবে না। মানুষের মহত্ত্ব তোমাদের নাগালের বাইরে।

একটা আবিষ্কার নিয়েই আমি এতকাল মেতে ছিলাম, সীমা। পৃথিবী থেকে কুষ্ঠরোগ চিরতরে দূর করে দেব। কিন্তু আরও একটা আবিষ্কার যে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে জানতাম না। জানতাম না আমাদের এই সমাজটাই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি নিয়ে যারা ওপর তলায় বসে আছে ঈর্ষা আর অহঙ্কারে সিংহমুখ নিয়ে, তারা ঐ সিংহমুখ শব্দটার অর্থও জানে না।

লায়ন্‌স্ ফেস। সিংহমুখ। ওটা ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির চিহ্ন নয়। ওটাই লেপ্রসির প্রাথমিক উপসর্গ। সমস্ত সমাজ এখন তাই সিংহমুখ হয়ে আছে। জানে না লেপার কথাটার আরেক নাম সিংহমুখ।

রাস্তা ধরে হেঁটে চলল দীপঙ্কর। ওর পা টলছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ওর মনে হচ্ছে যেন সারা শহর অট্টহাসে হাসছে। আঙুল দেখিয়ে বলছে, জালিয়াত, জালিয়াত।

সীমা, আমি বলেছিলাম, এখন সবুর করো। এখন সন্তান চেয়ো না। তা হলে সন্তানের চেয়েও যা আমার কাছে প্রিয়, সেই আবিষ্কার দূরে সরে যাবে। একটি শিশুর হাসির চেয়ে, কোটি কোটি মানুষের হাসি আমার কাছে আরও মূল্যবান।

সীমা, এখন আর তোমাকে আমি একটি সন্তানও দিতে পারব না। কারণ, তার পরিচয় হবে একজন জালিয়াতের সন্তান, একজন প্রতারকের সন্তান।

হ্যাঁ অমূল্য, আমি জানি, ওদের অশেষ ক্ষমতা। ওরা আমাকে অনুমতি দেবে না। বিজ্ঞানীদের সভায় গিয়ে আমি আমার বক্তব্য বলতে পাব না। আমি জানি এই অপবাদের পর আমার পেপার্স ছাপা হবে না। শুধু একটা চাকরি আমাকে বন্দী করে রেখেছে।

—চলুন দীপঙ্করদা, বাড়ি চলুন। কি সব আবোলতাবোল বলছেন, বাড়ি চলুন।

—কে, অমূল্য ? তুমি ?

দীপঙ্কর তাকাল অমূল্যর মুখের দিকে। কি যেন বিড়বিড় করে বলল নিজের মনেই।

—কি বলছেন ? বুঝতে পারছি না। অমূল্য বলল।

দীপঙ্কর তাকিয়ে রইল অমূল্যের মুখের দিকে। কি যেন ভাবল। তারপব বিড়বিড় করে বলল, স্টুপিড, আমি একটা স্টুপিড। সময় থাকতে আমি যদি ওদের মত টাকা করার কথা ভাবতাম, অনেক টাকা। তাহলে আজ আব ঐ সামান্য চাকরিটা আমাকে আটকে বাখতে পারত না। চাকরির আইনে আমি বন্দী হতাম না।

অমূল্য দীপঙ্করের কাঁধে হাত রাখল।—না, দীপঙ্করদা। তাহলে আপনি ঐ টাকার কাছেই বন্দী হয়ে যেতেন। ওদের মতই। চলুন, বাড়ি চলুন। সকলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্করের মুখ যেন ভয়ে সাদা হয়ে গেল।

চাপা গলায় বললে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ? কে ? কারা ? ওরা কি আমাকে ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবে ? সেই আগেকার দিনে কুষ্ঠরোগীকে যে-ভাবে মারা হত ? কিন্তু আমি তো লেপার নই। কেন মারবে ওরা ?

অমূল্য বিব্রতভাবে বলে উঠল, চুপ করুন দীপঙ্করদা, চুপ করুন। কি সব বলছেন !

দীপঙ্করের হাত ধরে টানল।—ভেতবে আসুন, দেখুন কারা এসেছেন। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন ওঁরা। আপনার অপেক্ষায়। সীমাবৌদির কথা শুনে তো আমি হন্যে হয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আপনাকে।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে তাকাল অমূল্যর মুখের দিকে।—কেন, আমাকে খুঁজছো কেন। হেসে উঠল, বললে, আমিই তো খুঁজছি। সাবা জীবন ধরে।

অমূল্য বললে, ঐ দেখুন, ডক্টর স্বামীনাথন বসে আছেন।

দীপঙ্কর কি যেন ভাববার চেষ্টা করল। কি যেন মনে পড়ছে না। তারপব হঠাৎ বললে, স্বামীনাথন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারপরই খুব চাপা গলায় বললে, আপনি পালান। ডাক্তার স্বামীনাথন, আপনি পালান। এখানে আসবেন না। ওরা বোধহয় জেনে গেছে, সব জেনে গেছে।

বঙ্কিমবাবু এক কোণে বসেছিলেন। খবরের কাগজটা পড়েই সক্কাল বেলায় চলে এসেছেন। রিসার্চের সেই নেশা, ওঁর সারা জীবনেব ব্যর্থতা এখন তো দীপঙ্করের মধ্যেই সাফল্য দেখতে চাইছে। এখন তো উনি একজন সামান্য প্যাথলজিস্ট।

উনি চেয়ার ছেড়ে কাছে এলেন। দীপঙ্করের হাতখানা ধরলেন মুঠো করে।—ডোন্ট ইউ গেট ডিসাপয়েন্টড, মাই বয়। শেষ বিচার একদিন হবেই হে।

দীপঙ্কর চিনতে পারল।—স্যার আপনি ? আপনাকেই তো খুঁজছিলাম। ঐ-সব কাচের টিউব, গ্যাস বার্নার, সব ভেঙে ফেলে দিয়েছেন তো ?

বঙ্কিমবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, সাবধান, আর্কিটেক্ট জানতে পারলে পুলিসে ধরিয়ে দেবে। আপনাব ঐ ছোট্ট ঘরে বিরাট বিরাট ল্যাবরেটরি ধরবে কি করে ? অনেক বড় বড় যন্ত্রপাতি ? আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে।

প্রফেসর কুণ্ডু অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিলেন। ওঁর কি রকম যেন সন্দেহ সন্দেহ ঠেকছিল। একবার সীমার মুখের দিকে তাকালেন, একবার অমূল্যর মুখের দিকে।

জানালার কাছটিতে বসে ছিলেন। বসে বসেই ডাকলেন, দীপঙ্কর, এদিকে এস।

ডাক শুনে দীপঙ্কর প্রফেসর কুণ্ডুর দিকে তাকাল। দ্রুত তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। তারপর চোখ পাকিয়ে ফিসফিস করে বললে, স্যার আপনি ? খবর্দার, আপনার ল্যাবরেটরির জিনিসপত্তর কাউকে ব্যবহার করতে দেবেন না, ওটা বে-আইনি। সব সময়ে আইন মেনে চলবেন, আইন। খুব কড়া আইন।

অমূল্য বললে, দীপঙ্করদা, এঁদের আপনি চেনেন না। ইনি একজন বিখ্যাত গাইনি, ডাক্তার মল্লিক আর ইনি নামী সার্জেন ডাক্তার সাহা। এঁরা কিন্তু বিশ্বাস করেন যে ··

দীপঙ্কর হেসে উঠল।—বিশ্বাস ? সেই ডাক্তার বিশ্বাস ? যিনি আমাকে ফোন করে সাবধান করেছিলেন ? বলেছিলেন, অনেকে ষড়যন্ত্র করছে ?

—না না, এঁরা আপনার আবিষ্কার যে সত্যি তা বিশ্বাস করেন। কত ইয়াং ডাক্তার এসেছে দেখুন, কমিটি বিশ্বাস করেনি বলে ওরা কমিটির মুখোশ খুলে দেবে বলেছে।

দীপঙ্কর হঠাৎ অমূল্যর মুখের দিকে তাকাল।—কে ? অমূল্য তুমি ? কি বলছিলে ? বিশ্বাস ? বিজ্ঞান তো বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয় অমূল্য। ওটা প্রমাণ করা যায়, ওটা যুক্তি। পরীক্ষা করে ওর ফল দেখানো যায়। আমি তো বিশ্বাস চাইনি। আমি শুধু ভ্যাকসিনটা কিভাবে আবিষ্কার করেছি, কিভাবে পরীক্ষা করেছি ইঁদুরের ওপর, বিসাস বাঁদরের ওপর, এমন কি মানুষের ওপর সে-কথাই জানাতে চেয়েছিলাম। ওরা তো নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারত।

স্বামীনাথন এগিয়ে এলেন। কি যেন বলতে চান।

হঠাৎ স্বামীনাথনের মুখের দিকে ফিরে তাকাল দীপঙ্কর।-- নো নো ডক্টর স্বামীনাথন। আমি ভুল বলেছি, মানুষের ওপর পরীক্ষা করে দেখিনি। আপনাকে আমি বিপদে ফেলব না।

এবার দীপঙ্কর ঘুরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললে, জেন্টলমেন, আমি আর কতটুকু কষ্ট পেয়েছি, যারা আমাদের জন্যে প্রাণ দেয়, নিজের শরীরে রোগ নিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করে, তাদের কথা ভেবেছেন কোনওদিন ? আসুন, দেখবেন আসুন।

বাইরে উঠোনে বেরিয়ে এল দীপঙ্কর। ওর পিছনে পিছনে সকলেই।

দীপঙ্কর তর্জনী দেখিয়ে বললে, ঐ দেখুন। সারি সারি খোপে খোপে রাখা ইঁদুর, সাদা ইঁদুর। গিনিপিগ, খরগোশ। ঐ দেখুন বিসাস বাঁদর।

অমূল্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, পৃথিবীতে মৌলিক আবিষ্কার একটাই। ডারুইন আবিষ্কার করেছিলেন। উই আর অল এপস্। বাঁদর।

কেউ হাসল না।

স্বামীনাথন অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিলেন। কি যেন বলতে চাইছেন, বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। হাতে একটা কি জার্নাল গোল করে পাকানো।

স্বামীনাথন এগিয়ে এসে দীপঙ্করকে কি যেন বলতে গেলেন।

আর দীপঙ্কর হঠাৎ পাগলের মত বলে উঠল, আঃ আমাকে বিরক্ত করবেন না। আপনারা চলে যান, চলে যান। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমাকে একটু ঘুমোতে দিন। বলেই আবার ঘরের মধ্যে ফিরে এল দীপঙ্কর। পিছনে পিছনে সকলেই।

স্বামীনাথন ব্যস্ত হয়ে বললেন, কিন্তু ডক্টর রয়, জার্নালটা দেখুন, একটা খবর আছে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে জিগ্যেস করল, কি খবর ? বলুন, বলুন।

দীপঙ্কর বললে, আঃ, আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে।

প্রফেসর কুণ্ডু বললেন, বলুন ডাক্তার স্বামীনাথন, কিসের খবর।

স্বামীনাথন ভাঙা গলায় প্রায় কান্নার স্বরে বললেন, লেপ্রসির ভ্যাকসিন।

ঐ কান্নার কণ্ঠস্বর কি আবেগের ? আনন্দের ?

ঘরভর্তি লোক উল্লাস প্রকাশ করল।—হ্যাপি নিউজ।

বঙ্কিমবাবু বললেন, আমি জানতাম। হবেই।

স্বামীনাথনকে কেমন বিচলিত দেখাল। কিংবা বিব্রত।

বললেন, এটা লন্ডনের মাইক্রোবায়োলজির জার্নাল। হাতের জার্নালটা দেখালেন।

বললেন, জার্নালটা জানিয়েছে শেষ পর্যন্ত লেপ্রসির ভ্যাকসিন পাওয়া গেছে।

কৌতূহলে স্তব্ধ হয়ে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। সকলের চোখ থেকে আগ্রহ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। শুনতে চায় ওরা, জানতে চায়। কি বলেছে ঐ জার্নাল ? যেন দীপঙ্কর রায়ের বিচার নয়, ক্ষমতায় অন্ধ ঈর্ষার, স্বার্থের, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এখনই একটা ভার্ডিক্ট শুনতে পাবে।

ওরা সকলেই স্বামীনাথনের মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করল। ডাক্তার স্বামীনাথন নন, যেন একজন বিচারক তাঁর উঁচু আসনে বসে আছেন। অনেক সওয়াল জবাব হয়ে গেছে। অনেক সাক্ষীসাবুদ ডাকা হয়েছে। আর্গুমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। বিচারক রায় লিখে এনেছেন। আজই এখনই পড়ে শোনাবেন তাঁর ভার্ডিক্ট।

দীপঙ্কর আর দাঁড়াতে পারছিল না। একটা চেয়ারে বসে পড়ল, ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে দিল। তারপর বিষণ্ণ গলায় বললে, স্বামীনাথন, ফর গডস সেক, তুমি চুপ কর। আমার বড়ো ঘুম পাচ্ছে। জানো, আমার মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল আমি ঘুমোইনি। আমাকে সেই ঘুমের মত শান্তির মধ্যে চলে যেতে দাও।

স্বামীনাথন বললেন, কিন্তু ডক্টর রয়, আপনাকে যে শুনতেই হবে। সকলকেই শুনতে হবে।

প্রফেসর কুণ্ডু উঠে দাঁড়িয়ে আবেগে থরথর করে কাঁপছেন।—আমরা শুনছি, বলুন আপনি, বলুন।

বঙ্কিমবাবু বললেন, আমি জানতাম। এই দিনটির জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। আমার কি যে গর্ব হচ্ছে।

স্বামীনাথন বিরক্তির স্বরে বললেন, এক্সকিউজ মি, আপনারা বড়ো ডিসটার্ব করছেন। একটু চুপ করুন, একটু চুপ করুন।

দীপঙ্করের চোখ জড়িয়ে আসছে তখন ঘুমে। অনুরোধের গলায় বলে উঠল, প্লিজ স্বামীনাথন প্লিজ। আমার ওসব শোনার আর কোন আগ্রহ নেই। আই ওয়ান্ট টু স্লিপ।

স্বামীনাথন বললেন, জার্নাল বলছে, ডক্টর আলটম্যানের এক্সোন ও একটা হরমোনকে মিডিয়া করে লেপ্রা ব্যাসিলি গ্রো করানো সম্ভব হওয়ার ফলে শেষ অবধি ইঁদুর বা বানরকেও লেপ্রসির হোস্ট করা সম্ভব হয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত লেপ্রসির ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

দীপঙ্কর আবার ঘুম জড়ানো চোখে বলে উঠল, আঃ, চুপ করো, চুপ করো।

প্রফেসর কুণ্ডু বলে উঠলেন, আমাদের বলুন ডাক্তার স্বামীনাথন। দীপঙ্করকে ঘুমোতে দিন, ও এক্সজস্টেড ও ক্লান্ত।

স্বামীনাথন গাঢ় গলায় বললে, এই রিপোর্টে বলা হয়েছে লেপ্রসির প্রিলিমিনারি ইনফেকশন থেকে শরীরে রোগ সৃষ্টি হতে প্রচুর সময় লাগে। ন-মাসও হতে পারে ন-বছরও হতে পারে, সেজন্যেই এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার করা এতকাল ছিল প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এবং এই ভ্যাকসিনের প্রতিরোধ ক্ষমতাও গড়ে উঠতে প্রচুর সময় লাগার কথা।

বঙ্কিমবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিক ঠিক। দীপঙ্করও আমাকে সে-কথাই বলেছিল। আমি জানি। ও বলেছিল, সেজন্যেই ভ্যাকসিনটা প্রেগনেন্সির আগে চাইলডের মাকে দিতে হবে। এর ফলে সেই বেবি জন্ম থেকেই প্রতিরোধ ক্ষমতা পাবে।

প্রফেসর কুণ্ডু বললেন, আমারও সেই রকমই মনে হয়েছিল। অর্থাৎ সেই লং পিরিয়ড অব ইনকিউবেশন প্রেগনেন্সির সময়ের মধ্যেই কনডেন্সড হয়ে যাচ্ছে। নাও ইট ইজ ক্লিয়ার। কেন কেবল মেয়েদের ভ্যাকসিনেট করাব কথা বলছিল দীপঙ্কর।

স্বামীনাথন বললেন, আরেকটা ব্যাপার হল এই ব্যাসিলিকে ফ্রিজ করে····

বঙ্কিমবাবু হেসে বললেন, সেই বুদ্ধিমান গাইনিরা যে পয়েন্ট-এ লোড শেডিংয়েব কথা তুলেছিলেন হে।

স্বামীনাথন বললেন, ইয়েস। লিকুইড নাইট্রোজেনে অথবা কার্বন ডাই-অক্সাইডে ওটাকে ফ্রিজ করে রাখা যায়, বহু বছব আগেই তা আবিষ্কৃত।

কিন্তু এই পণ্ডিতরা জানতেন না।

ঠিক এই সময়েই দীপঙ্কর বললে, প্লিজ স্বামীনাথন, হ্যাভ মার্সি অন মি। আমাকে একটু ঘুমোতেও দেবে না? আমাব ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

স্বামীনাথন বললেন, আমাকে শেষ করতে দিন। আর সামান্যই বাকি। যা এখানে কেউ বুঝতে পাবেনি, আমাকে বোঝাতে দিন। ঐ ড্রায়েড আপ ব্যাসিলিকে মিডিয়া হিসেবে গোনাডোট্রপিন হরমোনে বেখে কালচাব কবাব ফলে ঐ ভ্যাকসিন এক বিশেষ ধবনেব বন্ধ্যা নারীকেও····

এই সময়েই দীপঙ্কর চিৎকার কবে উঠল, প্রায কান্নাব স্বরে। বললে, তোমবা কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? আমাকে ঘুমোতেও দেবে না?

স্বামীনাথন বললেন, ফ্রেন্ডস্, আপনাদেব অন্তত শোনা উচিত। এবং শেষ খববটাও। এই জার্নাল সপ্রশংস ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছে এর আবিষ্কর্তাকে। আশা প্রকাশ কবেছে, পৃথিবীর আদিমতম যে বোগ হাজার হাজার বছব ধবে মানুষকে রোগযন্ত্রণা দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, রোগেব আক্রমণে তাকে এমনই বীভৎস কবে তুলেছে, যে স্ত্রী পরিত্যাগ কবেছে স্বামীকে, পুত্র পিতাকে, এবং সমগ্র সমাজ সেই পবিবারটিকে, এই ভ্যাকসিন হযতো একদিন সেই বোগ পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে পাববে। যেভাবে প্লেগ এবং পক্স থেকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে।

যেন একটা সার্মন পাঠ করলেন স্বামীনাথন। আবেগে কাঁপা গাঢ় কণ্ঠস্বরে যেন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘব ভর্তি লোক উচ্ছ্বাসে চিৎকাব করে উঠল।

প্রফেসর কুণ্ডু বলে উঠলেন, দীপঙ্কব, শোনো, শোনো।

বঙ্কিমবাবু আনন্দে উল্লাসে বলে উঠলেন, আমি জানতাম, আমি জানতাম। বিজ্ঞানকে কেউ চাপা দিয়ে বাখতে পারে না।

কে একজন গিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন দীপঙ্করেব কাঁধ ধরে নাড়া দিল।—ডাক্তাব রায়, শুনুন, শুনুন।

সঙ্গে সঙ্গে দীপঙ্কর ঘুমে জড়িয়ে আসা চোখ খুলে তাকাবাব চেষ্টা কবে প্রায় কান্নার গলায় বললে, আঃ আপনারা এত গোলমাল কবছেন কেন? আমাকে ঘুমোতে দেবেন না? আমি যে কতকাল ঘুমোইনি আপনারা জানেন না। প্লিজ, আমাকে শান্তির মধ্যে যেতে দিন।

বঙ্কিমবাবু আবেগে থবথর কবে কাঁপতে কাঁপতে দীপঙ্করের কাছে এগিয়ে গেলেন, দু

হাতের মুঠোর মধ্যে দীপঙ্করের একটা হাত ধরে ঈষৎ চাপ দিলেন, বললেন, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ। এতকাল ভাবতাম, একজন ব্যর্থ রিসার্চ-ওয়ার্কার আমি, আমার জীবনের কোনও জাস্টিফিকেশন নেই।

স্বামীনাথন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লেন। মাথা ঝুলে পড়ল। যেন ওদের দিকে তাকাতে পারছেন না।

কোনও রকমে চোখের সামনে জার্নালটা এনে বিড়বিড় করে বললেন, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ বেঙ্গলিজ। কেউ সকলের মধ্যে বিশেষ হয়ে উঠলে, ইফ হি ডাজ সামথিং এক্সেপশনালি গুড, আপনারা হয় শত্রুতা করেন কিংবা নির্বিকার থাকেন, যখন তার স্বীকৃতি আটকাতে পারেন না, তখন তাকে মাথায় তুলে নাচেন।

বলেই মুখ তুলে কঠিন চোখে সকলের দিকে তাকালেন। কঠিন গলায় বললেন, কিন্তু সব খবর আমি এখনও বলিনি। লিশন্, এখনও কিছু বলার আছে।

সমস্বরে সকলেই বলে উঠল, কি, কি বলার আছে ? বলুন, বলুন।

সকলেই উদগ্রীব। যেন এর পরও প্রচণ্ড আনন্দের কোনও খবর আছে।

স্বামীনাথন সকলের মুখের ওপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টিটা বুলিয়ে গেলেন, তারপর ভুরু কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন, কোথায় ছিলেন আপনারা এতদিন ? কেন প্রতিবাদ করে ওঠেননি ? কেন ঐ ষড়যন্ত্রটাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করেননি। ইউ আর সো মেনি, অ্যান্ড দে আর সো ফিউ।

যেন সকলের মুখের ওপর একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিলেন স্বামীনাথন। কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। চুপ করে রইল।

স্বামীনাথন বললেন, ওরা আপনাদের মনেও সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বলুন, সত্যি কিনা ?

কেউ কোনও উত্তর দিল না।

শুধু একজন কে ক্ষীণকণ্ঠে বললে, আরও কি খবর আছে বলছিলেন।

স্বামীনাথন বললেন, হ্যাঁ। সেটাই আসল খবর। ফ্রেন্ডস, আমি, আমি ··

গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল, কিছু বলতে পারছেন না স্বামীনাথন, কথা আটকে আসছে, হু হু করে কেঁদে উঠলেন। দু চোখ বেয়ে জল।

কোনওরকমে বললেন, আপনারা পড়ে নিন। বলে জার্নালটা এগিয়ে দিলেন।

প্রফেসর কুণ্ডু, বঙ্কিমবাবু, আরও অনেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। স্বামীনাথন এভাবে কেঁদে উঠলেন কেন ?

বঙ্কিমবাবুর হাত থরথর করে কাঁপছে। জার্নালটা স্থির ভাবে ধরতে পারলেন না, লাল দাগ দেওয়া জায়গাটা এগিয়ে দিলেন।

প্রফেসর কুণ্ডু পড়তে শুরু করলেন : এই আবিষ্কার যাঁরা করেছেন, ম্যাসাচুসেটস মাইক্রোবায়োলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডক্টর প্রফেসর গ্রাহাম জ্যাস্ট্রো এবং ডক্টর অ্যালবার্টো বিসেলিনি, যাঁরা বারো বছর ধরে এই গবেষণায় রত ছিলেন, আমাদের অভিনন্দন তাঁদের দুজনকেই।

লাইনটা পড়েই চেয়ারের ওপর ধপ্ করে বসে পড়লেন প্রফেসর কুণ্ডু।

নিজেই অবাক হয়ে বললেন, সে কি ! এ কি খবর আনলেন ডাক্তার স্বামীনাথন ?

বঙ্কিমবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, নো নো। কি বলছেন আপনি ? আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

স্বামীনাথনের জলে ভরা চোখ দুঃখের হাসি হাসল।—আমি সেজন্যেই এত তাড়াহুড়ো করছিলাম। আমি তো জানি, আবিষ্কার একটা রেস। সময় নষ্ট করার সময় নেই সেখানে।

স্বামীনাথন হাত বাড়িয়ে জার্নালটা চাইলেন। বললেন, দাঁড়ান দাঁড়ান, আরও একটা খবর আছে। এই দেখুন.....

জার্নালেব একটা অংশ দেখালেন।

এখন আর কারও কোনও আগ্রহ নেই। কেউ জানতে চাইল না, এর পরেও আর কি আছে।

স্বামীনাথন বললেন, ইন্ডিয়া সম্পর্কেও একটা খবব আছে। জার্নালটি জানাচ্ছে, লেপ্রসিব ভ্যাকসিন আবিষ্কাবের একটা ক্লেম কযেক মাস আগে ইন্ডিয়া থেকেও হয়েছিল। কিন্তু তাদের সাযেন্টিস্ট এবং ফিজিসিয়ানস্‌রা বলেছে সেটা ফেক।

প্রফেসর কুণ্ডুর বুক ঠেলে একটা শব্দ বেবিয়ে এল, উঃ। বুকের ওপব হাত বোলালেন। একটা দুর্বোধ্য কষ্ট।

বঙ্কিমবাবু চুপচাপ বসে আছেন, চোখের পাতা নডছে না।

অন্য সবারই মাথা ঝুলে পডেছে। যেন নিকটতম আত্মীয়ের শোকবার্তা শুনেছে এখনই।

স্বামীনাথন এতক্ষণে দীপঙ্করেব দিকে তাকালেন। দেখলেন দীপঙ্কর চেযাবে শরীর এলিযে গাঢ ঘুমে অচৈতন্য।

ওরা আব দীপঙ্করের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করল না।

স্বামীনাথন শুধু বললেন, আমি ওঁকেই শোনাতে চেযেছিলাম। আফটাব অল ওঁব ক্লেমটা যে ফেক নয, জালিযাতি নয়, তাব প্রমাণ তো পাওয়া গেল।

একটু থেমে বললেন, আপনারা ডক্টব বায়কে চেনেন না। লেপ্রসিব একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কাব হয়েছে এটাই ওঁব কাছে বড কথা। খ্যাতি নয়।

হাসবাব চেষ্টা করে বললেন, ক্ষতি আসলে আমাদেরই হল। হেবে গেলাম আমবাই, উই ইন্ডিয়ানস।

প্রফেসব কুণ্ডু ধীবে ধীবে বললেন, কোটি কোটি টাকা খবচ করে আমরা বিসার্চ ইনস্টিটিউট কবব, কিন্তু সেদিনও আবিষ্কাবককে আমবা গলা টিপেই মাবব।

একে একে সকলেই উঠে পড়ল। নিঃশব্দে বেবিযে এল ঘব থেকে। দীপঙ্কর ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

দল বেঁধে ওবা হেঁটে চলল, কেউ কোনও কথা বলল না। যেন কাবও কিছু বলার নেই।

শুধু বঙ্কিমবাবু অনেকখানি চুপচাপ হেঁটে এসে হঠাৎ কেন যেন ফিবে তাকালেন। দেখলেন, দবজাব সামনে স্থাণুব মত দাঁডিযে আছে সীমা। ওঁদেব দিকে তাকিয়ে আছে। পাষাণের মূর্তি যেন। দুটো চোখও যেন পাথবের।